# অন্তরে রাধা

বেদুইন

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ : জুন ১৯৫৭

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার : বি. কে. প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬০এ, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বিশ্বেন্দ্রনারায়ণ ও রাহুকে—

আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই—

মাঝরাতে সূর্যোদয়

অপরাধ অপরাধী

অতঃ কিম্!

পথে প্রান্তরে

ছোট্ট নদী। হিমালয় থেকে গলিত হিমকণা কোলে করে দুরন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে এসে কোন আদিম কালে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের অস্তিত্বও হারিয়েছে। তবুও নদী। ভূগোলের পাতায় উপনদী। তবুও নদীর একটা নাম আছে। মনে করা যাক নদীর নাম পাষাণী। বর্ষায় পাষাণীর ভয়ঙ্কর রূপ। নদীর উভয় কূল ভেসে যায় পাষাণীর জলে। ইংরেজ সরকার বাঁধ দিয়েছিল দু'পাশের গ্রামগুলোকে প্লাবনের হাত থেকে বাঁচাতে। নদীর এই রুদ্ররূপের পেছনে আছে বছরের পর বছর নদীর বুকে পলি। এই পলি ধীরে ধীরে নদীর গভীরতা হ্রাস করেছে সবার অলক্ষ্যে। রেললাইন পাতার সময় বে-হিসাবী রেলসেতুর বন্ধন পলি জমতে বেশি সাহায্য করেছে।

দু' পাশের গ্রামের লোক নদীর নাম দিয়েছিল পাষাণী। নির্মম নিষ্ঠুর এই খরস্রোতা নদী যখন ভয়ঙ্কর চেহারায় ছুটে চলে তখন দু' পাশের মানুষ ছোটে আশ্রয়ের আশায়। আবার ফিরে আসে নদীর কিনারায় ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ি মেরামত করে বাস করতে। নদী তাদের সাময়িক সর্বনাশ করলেও নদীর পলি ক্ষেতের ফসল বাড়ায়। অপর্যাপ্ত ধান ও রবিশস্য পেয়ে এক আধ মাসের দুঃখ ভুলে যায় বন্যাপীড়িত মানুষরা। তারা পাষাণীকে 'প্রাণদায়িনী মনে করে।

সব বছরই সমান চলে না। কোন কোন বছর নদীতে জল নামলেও প্লাবন হয় না। চাষের ক্ষেতে ফসলও তেমন ফলে না। সবাই প্লাবনকে অভিশাপ মনে করে না, মনে করে আশীর্বাদ।

নদীর দু'পাশে ছিল চৌধুরীবাবুদের জমিদারী।

হেসটিংস সাহেব বড় জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত তথা ক্ষমতা অবলুপ্ত করতে যখন নতুন নতুন কানুন চালু করেছিল সেই সময় বিরামনগরের চৌধুরীরাও অনেক টাকা সেলামি দিয়ে এগারটা মৌজার জমিদারী লাভ করেছিল। দেশের লোক বলত, এগার কোঠার রাজা। রাজত্ব যত বড়ই হউক, তার জন্য ইংরেজ রাজত্বকালে সৈন্যসামন্ত দরকার না হলেও 'দরকার ছিল পাইক, বরকন্দাজ, নায়েব, গোমস্তার একটা ছোটখাট ব্যাটেলিয়ান। এই ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার-ইন-চিফ্ ছিল চৌধুরীবাবুরা। সবাই বলত রাজা।

ভুবন রজক বিরামনগরের নামজাদা পেয়াদা। ভুবনকে কাজে অকাজে চৌধুরীদের প্রয়োজন হত। শোনা যায় নরাণাং নাপিতঃ ধূর্তঃ। সত্যিই ধূর্ত কিন্তু নরসুন্দর সম্প্রদায়, সে বিষয়ে কোন যাচাই হয়নি। তবে ভুবন রজক যে খুবই চতুর ছিল এ বিষয়ে ওর সমকালীন সঙ্গী সাথীরা একবাক্যে স্বীকার করত। রাজা বাহাদুরের কৃপায় ভুবন চাকরাণ জমি বাদেও প্রায় একশত বিঘা চাষের জমি পত্তনি পেয়েছিল।

ভুবনের মৃত্যুর পর তার পুত্র অবিনাশ বিরামনগর ছেড়ে তাদের আদি বাসস্থান সমসেরপুরের কাছে নদীর ওপারে কাঁদনগাছি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। জাত ব্যবসায়ে হাত দিতে হয়নি কখনও। ভাগচাষে যা পেত তা অফুরন্ত। লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা। অবিনাশ নিজে সামান্য লেখাপড়া জানত। তার ইচ্ছা ছিল তার ছেলেও লেখাপড়া শেখে। আশে পাশে আট মাইলের মধ্যে কোন পাঠশালা ছিল না। অবিনাশ নিজের ছেলের জন্য শহর থেকে পণ্ডিত ডেকে এনে বাড়িতেই পাঠশালা বসিয়েছিল। জমিজমা তেজারতি বুঝতে হলে লেখাপড়া শেখাটা অনিবার্য। কিন্তু তিনটাকা বেতনের পণ্ডিত মশায় পাঠশালা বন্ধ করে হঠাৎ একদিন ফিরে গেলেন নিজের গ্রামে। দু-তিন গ্রামের মোড়লরা বসে স্থির করল পাঠশালা বসাতে হবে। স্থান ঠিক হল গোবিন্দপুর। অবিনাশের গ্রামের চেয়ে তার দূরত্ব প্রায় আধমাইল। দেখতে দেখতে পাঠশালায় ছেলেমেয়ে জমতে থাকে।

এমন কি মুসলমান ঘরের ছেলেরাও আসতে থাকে। আসতে থাকে দু-একটা অল্পবয়সী মুসলমান মেয়েও।

অবিনাশ যত দিন জীবিত ছিল ততদিন পাঠশালার জন্য নানাভাবে সাহায্য করেছে। বিপদ হল তার তৃতীয় পুরুষ রমেশকে নিয়ে। রমেশ তার চোখের মণি। রোজ পাঠশালায় যায় আর অবিনাশ আতঙ্কে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। কারণটা নেহাত অবহেলা করার মত নয়। রমেশকে পাঠশালায় যেতে হয় মল্লিকদের পুকুরপাড় দিয়ে। অবিনাশের সদা ভয় থাকে রমেশ যদি পা পিছলে পুকুরে পড়ে যায় তা হলেই সর্বনাশ, যতক্ষণ রমেশ পাঠশালা থেকে ফিরে না আসে ততক্ষণ অবিনাশ ছট্‌ফট্ করে, ঘর-বাইর করে। রমেশের মা শ্বশুরের এই অস্থিরতা দেখে মাঝে মাঝে প্রবোধ দেয়। কিন্তু অবিনাশ প্রবোধ মানার লোক নয়, সে বিরক্ত হয়। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ভাবে, এতো বৌমার বাপের বাড়ির ছেলে নয়, এতো ভুবন পেয়াদার বংশধর। রমেশ পেয়াদা বড় হবে, জজ ম্যাজিস্ট্রেট না হলেও মহকুমা শহরের মোক্তার তো হতে পারবে। হয়ত বৌমা ভাবছে তার বাপের বাড়ির লোকের মত এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে তার নাতি 'হিস্‌সো-হিস্‌সো' করে নোংরা কাপড় ধোলাই করবে। তা হবে না। রমেশকে মানুষ করতে হবে।

ছোটবেলাতেই রমেশ বাবাকে হারিয়ে কর্তাবাবার হাত ধরেই বড় হচ্ছিল। হয়ত অবিনাশ তার আশা পূরণ করতে পারত। কিন্তু পাঠশালার পাঠ শেষ করে রমেশ গিয়েছিল মহকুমা শহরের ইংরেজী স্কুলে পড়তে। নবম শ্রেণীতে উঠবার আগেই পড়া ইতি করে ঘরে আসতে হল তাকে। অবিনাশ হঠাৎ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হওয়াতে সব ইচ্ছা অনিচ্ছার সমাপ্তি ঘটল।

রমেশ ঘরে ফিরে এল। পড়ার পাট চুকে গেল।

মাঝে মাঝেই কর্তাবাবার পাশে বসে ভাবত, এই মানুষটা কত না ভালবাসে তাকে। আজ বিছানায় শুয়ে শুয়েও সে ভাবছে রমেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। এমন একদিন ছিল যখন রমেশের পথ চলতে

যাতে কোন বিপদ না হয় সেজন্য লাঠি ঠুকতে ঠুকতে তার কর্তাবাবা তার পাঠশালা থেকে আসার পথে গিয়ে অপেক্ষা করত। একবার রমেশ এসে বলল, দাদু আজ মল্লিকদের পুকুরপাড়ে মস্ত একটা সাপ দেখলাম।

অবিনাশ চমকে উঠে বলল, বলিস কিরে, তা হলে তো আমাকে গিয়ে বসতে হবে পুকুরপাড়ে। পাঠশালা থেকে আসার সময় রোজ তোর জন্য অপেক্ষা করব।

শুনতে পেয়ে রমেশের মা আপত্তি করেছিল।

অবিনাশ বলেছিল, কি বলছ বৌমা, রমেশ আমার শিবরাত্রির সলতে। যদি কিছু ভাল মন্দ হয়। আর সাপকে বিশ্বাস নেই। মল্লিকদের পুকুরপাড়ে যা ঝোপ জঙ্গল, বাপ্‌রে। বিশ্বাস নেই বৌমা।

অবিনাশ পেয়াদা সেই থেকে কম করেও দুটো বছর মল্লিকদের পুকুরপাড়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকত রমেশের পাঠশালায় যাতায়াতের সময়।

অবিনাশ তাকে শেখাত, মিছে কথা বলিস না রমশা। কারও কোন ক্ষতি করিস না। কোন ছোট কাজ করিস না। ছোট কাজ কেউ করলে মাপ করিস না। আমরা জাত ধোপা, ময়লা কাপড় সাফ্ করি, মনটাও সাফ রাখবি। আর পেশায় আমরা পেয়াদা, তাই লাঠিকে ভয় করিস না।

সেই কর্তাবাবা আজ ভাল করে কথা বলতে পারে না, পাশ ফিরে শুতে পারে না। রমেশের কিশোর মনে কর্তাবাবার প্রভাব যথেষ্ট, কর্তাবাবাই তার দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র। অথচ আজ একি অবস্থা।

মাকে বলেছে, ভাল ডাক্তার দেখাও মা। কর্তাবাবা নইলে বাঁচবে না।

তোর কর্তাবাবা কি কারও কথা শোনে। বলে সন্ন্যাস রোগের কোন দাওয়াই নেই বৌমা। হর কবিরাজ বিনা আর কেউ চিকিৎসা করতে পারবে না। আর ডাক্তার তো এ তল্লাটে নেই, শহরে যেতে হবে, থাকতে হবে। দরকার কি। কাঁদনগাছির মাটিতে সবাই মরেছে,

আমরাও মরব। এর জন্য তোমরা মোটেই ভেব না। ভাবছি, আমি মরলে তুমি আর রমশা সংসার সামলাতে পারবে কিনা!

অবিনাশ বুঝতে পেরেছিল তার মৃত্যুকাল সমাপন্ন। রমেশকে পাশে বসিয়ে বলল, ভেবেছিলাম তোকে অনেক বড় করব। হল না রে। সংসারে তোকে জড়িয়ে দিতে হল কচি বয়সে। সব বুঝে নে, তোর মা বুদ্ধিমতী লেখাপড়া না জানলেও চালিয়ে নেবে, লেখাপড়ার কাজটা তোকেই করতে হবে।

সব কিছু বুঝিয়ে অবিনাশ কাঁদনগাছির মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

রমেশও জড়িয়ে পড়ল সংসারের আবর্তে।

সঙ্গী বলতে ঘরে তার মা আর বাইরে কচি মিঞা। ইদিলপুরের কলাই মিঞার ছেলে কচি। পাঠশালায় কচি ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলাই মিঞার অবস্থা ভাল। চাষের জমি আছে, একজোড়া বলদ আছে। পাঠশালার পড়া শেষ করে কচি বাপের সঙ্গে চাষবাসের কাজ করে। বিকেলে সময় পেলেই আধ মাইল পথ হেঁটে আসে রমেশের কাছে। কখনও কখনও রমেশও যায় কচির বাড়িতে। দুই বন্ধুতে গল্প গুজব করে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই ঘরে ফিরে যায়। এইভাবে কয়টা বছর কেটে গেল। রমেশ বড় হল, যৌবনের দুয়ারে পা দিয়েছে তখন। কচিও বড় হয়েছে। তবে আজকাল কচি খুব আসে না। মাসে দু'মাসে আসে, রমেশও মাসে দু'মাসে যায় তার বাড়িতে। যাতায়াত কমলেও তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। রমেশ গ্রামের অর্থবানদের সেরা। তার মা সব কিছু সামলায়, রমেশ হিসাবপত্র করে ধান আদায় করে। তেজারতি ব্যবসা তুলে দিয়েছে, ওসব হাঙ্গামা সে পোয়াতে পারে না।

মাঝে মাঝে পাষাণীর বাঁধে গিয়ে বসে। কেমন উদাস উদাস তার ভাব ও ভঙ্গি। নদীর বুকে ছোট ছোট নৌকাগুলো ভাসতে ভাসতে যখন চলে তখন রমেশের মনও ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যায়। সূর্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে রমেশ ফিরে আসে তার বাড়িতে।

বিরাট শূন্যতায় ভরে ওঠে তার মন। কচির সঙ্গেও দেখা নেই, অথচ তার সঙ্গে দেখা করার কেমন একটা আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে তার মনে হয় তবুও ইদিলপুরে যাবার ইচ্ছাটা মনের কোণে চাপা থেকে যায়। নদীর প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করে সব সময়। বিকেল হলেই নদী তাকে আকর্ষণ করে। চাষের সময় তিন চার মাস রমেশ মাঠের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তারপর থাকে বছরের আরও সাত আট মাস। অলস জীবনযাত্রা। অলস জীবনের সঙ্গী পাষাণীর আকর্ষণ।

শীতটা শেষ হয়ে সবে মাত্র ফাল্গুনের শেষ। দিনটাও বড়। রমেশ অবসর কাটাতে প্রতিদিনের মত সেদিনও পাষাণীর বাঁধে এসে বসেছে। তার পেছনে রয়েছে তার গ্রামের চৌহদ্দী, আর আম কাঁঠালের বাগান, নাম না জানা গাছের ঝোপ। মিঠে বাতাসে পা ছড়িয়ে বসেছিল রমেশ। তার কানে ভেসে এল বাঁশীর শব্দ। বাঁশীর মিষ্টি সুরেলা সুর তাকে কেমন উতলা করে তুলল। বাঁশীর আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। বাঁধের ধারে একটা ঝোপের পাশে কে যেন বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল। রমেশ অতি সন্তর্পণে তার পেছনে এসে দাঁড়াল! বংশীবাদক টেরও পায়নি তার উপস্থিতি।

রমেশ চিনতে পেরেছিল তাকে।

বলল কে, কে ওখানে বাঁশী বাজায়? কচি না?

আরে রমেশ যে। বলেই বাঁশীটা বাঁ হাতে চেপে ধরে কচি উঠে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বলল, হাঁরে, আমি কচি, তোর কাঁচু।

রমেশ বলল, আবার বাজাত। ভারি মিষ্টি এই বাঁশীর সুর।

কচি হেসে বলল, বাঁশী চিরকালই মিষ্টি। তোদের কেষ্টঠাকুর বাঁশী বাজিয়েই তো রাধাকে ঘর ছাড়া করেছিল। তোদের আয়ান ঘোষের কপাল মন্দ, তাই ঘরের বউ পর হয়ে গেল।

তুই বুঝি ঘরের বউ বাইরে টেনে আনতে চাস?

বলেছিস ভাল। সে শ্যামও নেই, সে রাধাও নেই। আমার

বাঁশী শুনে রমেশ আসলেও, কোন রাধা আজও আসেনি, কখন আসবেও না।

বলিহারি তোর হিসাব। তুই অমন বাঁশী বাজানো শিখলি কোথায় ?

ওস্তাদের কাছে।

ওস্তাদ, বলে থেমে গেল রমেশ। কিছুক্ষণ কচির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল আরেকবার তোর বাঁশী শোনা ভাই।

রমেশ কচির পাশে চুপ করে বসে পড়ল।

কচিও বাঁশীতে ফুঁ দিল। ফুঁয়ের সাথে সাথে দু' হাতের আঙ্গুল-গুলোর ওঠানামা রমেশ অবাক হয়ে দেখছিল। কখন যে কচির বাঁশী থেমে গেছে তারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে রমেশ বলল, সুন্দর! তোর ওস্তাদের কাছে আমাকে নিয়ে যাবি ভাই, আমিও শিখব বাঁশী বাজানো। নিয়ে যাবি ?

কচি হেসে বলল, যেতে হবে না রমেশ। আমি শেখাব। একটি শর্তে।

কি শর্ত, বল।

আমাকে ওস্তাদ বলে মানতে হবে। তখন কিন্তু বলতে পাবি না, আমরা ছিলাম পাঠশালায় একই কেলাশের পড়ুয়া। কেমন পারবি তো ?

রমেশ আগ্রহ সহকারে বলল, মানব তোকে ওস্তাদ বলে। ঠিক মানব তোকে।

কচি কি যেন ভেবে বলল, কি হবে বাঁশী বাজিয়ে ? শিখে কি করবি রে রমেশ ?

শিখব! তবে ভাবছি একটা কাজ করলে কেমন হয় ? আমরা দুজন মিলে একটা কেষ্টযাত্রার দল খুলব। বছরে দু-একবার আমাদের তোদের গ্রামে কেষ্টলীলার পালা গান করব। ভাল করে দুজনে যদি আসরে বাঁশী বাজাতে পারি তা হলে আসর মাত হবে।

কচিও ভাবল রমেশ তো মন্দ কথা বলেনি। সে বলল, তা মন্দ

নয়। বছরের চার মাস তো চাষের কাজ। আট মাস ঘরে বসে কাটাই। গোঁয়া ঝগড়াঝাটি করে দিন কাটাতে হয়, কখনও কখনও নদী নালায় মাছ মেরে সময় কাটাতে হয়। এই সময়টা আমরা আনন্দ করতে পারি, আনন্দ বিলোতেও পারি। আসল সমস্যা হল টাকা। টাকা পাব কোথায়? বাদ্যযন্ত্র চাই, বাজনদার চাই, পালা বাঁধার লোক চাই। অনেক চাই। নারে, এসব হবে না, শেষ পর্যন্ত দেখবি সব ফক্কা।

রমেশ বাধা দিয়ে বলল, হতাশ হোস না, যন্তর টন্তর আমার।

আর বাজনদার, পালা বাঁধা?

পালা বাঁধব আমি। বাজনদার? খুঁজতে হবে। পেয়ে যাব বুঝলি।

তুই তো সবই সহজ করে বললি কিন্তু পালা বাঁধলেই কি হয়? কেষ্ট কে হবে?—তুই? বেশ! আর রাধা?—তুই। জানিস তো আজকাল গাঁয়ের মানুষ দাড়ি গোঁফ কামানো ছেলে-রাধা পছন্দ করে না। কজন সখী চাই,—এসব বড় হাঙ্গামা। এতো সামাল দিতে পারবি?

রমেশ হাসতে হাসতে বলল, তুই হবি কেষ্ট, আমি হব রাধা।

তা তোকে মানাবে ভাল। গোরা গোরা রং, মুখখানাও ভাল কিন্তু পরচুলায় মাথা ঢাকলে কেমন হবে তাই ভাবছি। তবে তোকে মানাবে ভাল।

ভাবতে হবে না। ক'মাসে চুলের বাহার নিয়ে আসব। নাপিত টাপিত বাদ। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ছোট ছোট এগার-বার বছরের গরীব ঘরের মেয়ে খুঁজে আনব। পরে দেখবি মেয়েদের ভিড় জমবে। পালা গানের দিন খেতে দেব, দেব কিছু নগদ কড়ি। ঠিক পাব। তখন দেখবি কাকে নেব আর কাকে নেব না তাই ভাবতে ভাবতে আর বাছতে বাছতে হয়রাণ হয়ে যাবি। অবশ্য বড়দের প্রবেশ নিষেধ।

তোর মত আশাবাদী আমি নই। পাবি কি? আমার তো মনে হয় না।

পেতেই হবে। পয়সা দেব, নাচ শেখাব, গান শেখাব, পালা যেদিন হবে সেদিন পেট ভরে খেতে দেব। ঠিক মেয়ে জোগাড় হয়ে যাবে। অত ভাবিস না। তুই রাজি তো?

কচি এবার যেন মনে বল পেল। বলল, আমি রাজি। তবে তোকে রাধা সাজালে মানাবে ভাল। গলা তোর ভাল, রংটাও গোরা, দেহটাও মানান সই কিন্তু দাড়ি গোঁফ কামালেই লোকে বুঝে ফেলবে এটা হল ছেলে-রাধা।

তুই কাজে নেমে পড়। এটা একটা ধাপ্। পবের ধাপে ভাসান যাত্রা।

খোদা মালুম, একটাই হোক আর ভাসান যাত্রায় ভেসে কাজ নেই। তবে কথা রইল, সব কিছুর দায় তোব।

বমেশ বলল, দলের ম্যানেজাব হবি তুই।

তা বটে। কচি মিঞা ম্যানেজার আব রমেশ পেয়াদা অধিকারী। সব দায় তোর।

সেদিনের আলোচনা এখানেই শেষ। কচি যেমন বুঝল কাজটা সহজ নয়। রমেশও তেমনি বুঝল সব কিছুর দায় মাথা পেতে নিলেও অনেক জল সাঁতরে তবেই ডাঙ্গায় উঠতে হবে।

এবার কাজের কাজ করতে হবে।

লোক জোগাড় করা, মহলা দেওয়া, যন্ত্রপাতি কেনা কাটা করা, এসবই একার কাজ নয়। দুজনে নেমে পড়ল কাজে। কিছুটা কাজ এগোনর পর আকাশে দেখা দিল মেঘ। বৃষ্টি নামল। কচি, রমেশ দুজনেই চাষের কাজে নেমে পড়ল। বর্ষা কালটা কেটে গেল মাঠে মাঠে। ধান রোয়া শেষ করে আবার দুজনে বসল কেষ্টযাত্রার দল গড়তে। ধান কাটার অনেক দেরি, এই সময়ের মধ্যে পালা বাঁধা শেষ করতেই হবে।

রমেশ কাগজ কলম নিয়ে বসল। কচি গেল বাগদী পাড়ায় আর দুলে পাড়ায়। বৈষ্ণবদের আখড়াতেও হামলা করল। প্রথম এল কেষ্টদের বার বছরের মেয়ে শ্যামা। তারপর পেল ঝুঁচি।

বুঁচির বয়স বড় কম, তার দেহের বৃদ্ধি আছে। এরপর এল বৈষ্ণবদের লতিকা আর মুচিদের পাঁচু। সখীর দলে চারজন, কম কথা নয়। রিহার্সেল আরম্ভ হল অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন।

এরপর ঢোলক, মন্দিরা আর হারমোনিয়াম হল তাদের বাদ্যযন্ত্র। নিতাই আর ভবেনকাকা নিল গান আর নাচ শেখাবার দায়িত্ব। সবই ভাল কিন্তু মেয়েদের দিয়ে পদের অনেকগুলো লাইন মুখস্ত রাখানো হল দায়। এদের একজনও লেখাপড়া জানে না, ভাল করে শুদ্ধ বাংলাও বলতে পারে না। মুস্কিলে পড়ল কচি মিঞা। রমেশ বলল, এদের অক্ষর পরিচয় করাতে হবে রে কচি। তবে এখন নয়। একবার পালায় নামালে দেখবি এদের মন মজে যাবে। তখন পাঠশালার পণ্ডিতের মত আমরাও বেত হাতে করে এদের পড়ুয়া করে তুলতে পারব।

জোসেফ বিশ্বাস এসেছিল রমেশের কাছে।

তোমরা বুঝি পালা গান করবে রমেশ?

হ্যাঁ কাকা।

লোকজন ঠিক ঠিক পেয়েছ তো?

মোটামুটি। এবার তো বউনি হবে, যারা ঠিক ঠিক পারবে আর থেকে যাবে তাদের নিয়ে আসছে বছর ভুল ভ্রান্তি শোধরাব।

আমার মেয়ে মেস্তিকে তোমার কাছে পাঠাব। তাকে একটু তালিম দিয়ে পাকিয়ে দেবে। সে বোধহয় পারবে।

এবার তো বেশি লোক নিতে পারব না কাকা। সবাই তো বেগার দেবে না। কিছু কিছু হাতে দিতে হবে। নইলে গরীবের মেয়েরা আসবেই বা কেন!

মোসেদ মুরুব্বি চালে বলল, সেটাই তো বলছি রে বাপ্। তোমার কাছে শিখে পড়ে নিতে পারলে মেস্তি আখেরে কিছু করতে পারবে। তাই বলছিলাম, মেস্তিকে পাঠিয়ে দেব একটু তালিম দিয়ে তোমার দলের উপযুক্ত করে নিও।

রমেশ বলল, কাকা এসব কাজ করে কচি। তাকে বলবেন,

আমিও বলে দেব। কতটা কি হবে, কজন দরকার জেনে কচি ব্যবস্থা করে দেবে।

পৌষ মাঘ দুটো মাস মহরা দেখার পর রমেশ অনেকটা অবস্থা বুঝে নিল। এবার ট্রায়াল। রমেশের বাড়ির উঠোনে ট্রায়াল হল দুবার। একবার দিনে একবার রাতে। গানের মাস্টার ভবেন পদাবলীর পদে সুর দিয়েছে, কচি আর রমেশ গলা মিলিয়ে কেষ্ট যাত্রার যাত্রা পথ সুগম করেছে, বুঁচি, শ্যামা, পাঁচু আর মেন্তি কোরাসে দোহায়ের মত নেচে নেচে গান ধরেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলেছেন।

রাধা বেশে রমেশ গান ধরল, তোমার বিহনে পরাণের জ্বালা শমিত হবে কি রাই ?

সেদিনের ট্রায়ালে যারা শ্রোতা তারা বাহবা দিল উৎসাহ দিল। রমেশও কোমর বেঁধে নামল তার দলকে মজবুত করতে।

কচি বলল, তা হলে ?

তা হলে আর কি। ঢ্যাড়া দে। আমাদের গাঁয়ের শেষ প্রান্তের বটগাছকে নিশানা করে ঢোল সাহবত করে জানিয়ে দে। কাঁদনগাছির বুড়ো গাছতলায় শনিবার রাতে কেষ্টযাত্রা হবে। কাউকে পয়সা দিতে হবে না। ঢ্যাড়া দিবি তোদের গাঁয়ে, আমাদের গাঁয়ে, সমসেরপুরে, হাটগাছায় আর গাং এর ওপার শলশলিয়া আর মেরকাটায়। তারপর মুখে মুখে চালু হয়ে যাবে।

কচি গেল ধর্মদাস বাদ্যকরের খোঁজে। যাতে ঢ্যাড়া ভাল করে দেওয়া হয় তা পাকা করতে।

সমসেরপুর হল মেলামেশার গ্রাম।

এক ঠেরে মুসলমানদের বসতি, মাঝে কয়েক ঘর কৃশ্চান, তার পাশাপাশি কয়েক ঘর অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু আর অপর ঠেরেতে কয়েক

ঘর বর্ণ হিন্দু। প্রায় সর্ব ধর্মের আর ছোট বড় সব শ্রেণীর বাসস্থান এই গ্রামকে মেলামেশার গ্রাম বলে। পনের ষোল বছর আগে পাদরী সাহেবরা এখানে একটা পাঠশালা করেছিল। আজও সেটা আছে। শিক্ষার্থীর অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু, কৃশ্চান আর মুসলমান। এদের ঘরের ছেলে মেয়ে পড়তে আসে পাঠশালায়। তবে মেয়েদের সংখ্যা নগন্য। হিন্দু কৃশ্চান ঘরের মেয়েরা যাও বা আসে মুসলমানদের ঘরের মেয়ে কচিৎ কখনোও দেখা যায়। কোন কোন বছরে দু-একজন এলেও দশ বছর হতে না হতেই তারা পড়ায় ইস্তফা দিয়ে বাপ মায়ের সংসারে কাজে নেমে পড়ে, তারপরই বেহেস্তর রাস্তা খুলতে বিয়ের ব্যবস্থা, চোদ্দ কখনও পেরোয় না মুসলমান মেয়েদের, তার আগেই চালান হয়ে যায় স্বামীর ঘরে।

সমসেরপুরের সঙ্গতি সম্পন্ন চাষী হাসমত। বিবি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বেশ সাজানো সংসার। হাসমতের বড়ই জ্বালা তার বড়মেয়ে আয়নাকে নিয়ে। ছোটবেলায় আয়না তিন বছর পাদরিদের পাঠশালায় পড়ে বেশ পাকা মাথার মেয়ে হয়ে উঠেছিল। তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে হাসমতও পবিত্র কাজ করেছিল।

খোদা নারাজ। পনের বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এল আয়না।

আয়নার রূপ ছিল, বয়সের জৌলুষ ছিল তাই হাসমত আয়নাকে ঘরে রাখতে সাহস পেত না।

হাসমত যতবার নিকে করতে বলেছে ততবারই সে ঘাড় বাঁকিয়ে অনিচ্ছা জানিয়েছে। হাসমত জোরজবর দস্তির চেয়ে বুঝিয়ে কাজ করতে চায়। আয়না কিন্তু গোটা সংসার রক্ষা করে চলেছে।

ধান সেদ্ধ করা ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, ঝাড়া সবই করত আয়না। গরুর সেবা করা ছিল তার নিত্যকার কাজ। গরুর গোয়াল পরিষ্কার করা, মাঠে গরুকে খুঁটো দিয়ে আটকে রেখে জাব দেবার ব্যবস্থা করা, সব কিছুই করত আয়না। আর রাতের বেলায় পিদীম জেলে মানিকপীরের পুঁথিও সুর করে পড়ত। তার পুঁথি পাঠ শুনতে

আসত পাশের বাড়ির রাবিয়া, খালেদা আর তাদের মেয়েরা। খালেদার ছুটো মা পালা করে পুঁথি শুনতে আসত। আয়নার গলায় যেন মধু ছিল। সেই মধুর লোভেই পাশের বাড়ির মেয়েরা আসত পুঁথি শুনতে।

সেদিন হাসমত ঘরের দাওয়ায় বসেছিল। আয়না গেছে মাঠে গরু বাঁধতে। হাসমতের বিবি বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করে নাস্তা পানির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। এমন সময় ধর্মদাস বাদ্যকরের ঢোলসহরত শোনা গেল।

কাঁদনগাছির বটতলায় শনিবার রাতে কেষ্টযাত্রা হবে। গাঁয়ের দলের পালা। সবাই ফিরি, পয়সা লাগবে না, সবাই আসবেন।

তারপরই ডুগ্‌ ডুগ্‌।

ধর্মদাস বাদ্যকর ঢ্যাঁড়া দিয়ে এগিয়ে যায় এক পাড়া ছেড়ে আরেক পাড়ায়।

হাসমত সকালবেলায় গরুর তদ্বির করতে বের হয়েই দেখল গোয়ালে গরু নেই, আয়নাও ঘরে নেই। তার কালো বলদটা সামনের মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। এখুনি হয়ত আল্লারাখার বাগানে ঢুকে পড়বে। তা হলে আব রক্ষা নেই। হাসমত চিৎকার করে আয়নাকে ডাকতে থাকে। হাসমতের গলার শব্দে তার বিবি আতরি ভেতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?

কেন? ওই দেখ। কালো বলদটা দড়ি ছিঁড়ে ঘুরছে। এখুনি আল্লারাখার বেগুন খেতে ঢুকলেই খেজালত আরম্ভ হবে। ওটা বেঁধে দিতে হবে।

তুমি দেখছি নিকম্মা মরদ। তুমিই তো পার ওটাকে বেঁধে দিতে।

পারিরে পারি। তবে ওটা হল আয়নার পেয়ারের। আমি কাছে গেলেই ঢুঁষতে আসে তাই আয়নাকে ডাকছি।

তোমার মত নিকম্মা মরদের ওটাই হল জওয়াব।

জওয়াব শুনে কি করবি। সেয়ানা মেয়েটা ঘরে বসে গিলবে

আর আমি খোরাক জোগাব। তা হবে না। কাজ কাম করতে হবে। বললাম আয়না নিকে কর। তা করবে কেন? তাতে যে তার বাপের উপকার হত! নসীবে দুঃখ থাকলে এমনই হয় রে আতরি। নিজের কপাল পুড়েছে, এখন সবার কপাল খাক্ না করে হারামজাদী!

পরের কথা শোনা গেল না।

ধর্মদাসের ঢ্যাঁড়ায় সব চাপা পড়ে গেল।

ঢ্যাঁড়া শুনে আয়না দ্রুত পদে পাশের মাঠটা পেরিয়ে আসছিল। বাবা মাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল।

ঢোল সহরত শুনলে তো বা'জান? বলেই আয়না হাসমতের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

গম্ভীর ভাবে হাসমত বলল, হুঁ। ধোপাপাড়ার ছোঁড়া রম্‌শা আর কলাইয়ের বেটা কাঁচু দল গড়েছে। তাদের পালা গান।

আয়না এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। বলল, পালা শুনতে যাবে বা'জান?

হাসমত জিব কেটে বলল, তোবা, তোবা। হিন্দুঁর দেবতা নিয়ে ওরা নীলেখেলা করবে। আমরা কি যেতে পারি। গুনাহ্ গুনাহ্।

আমরা হিন্দুঁর গান শুনব না। শুনব গান আর পালা! আমি যাব বা'জান ছোটভাই রসিদকে নিয়ে যাব। এ পাড়া আর ও পাড়া। যাব তো?

যাওয়া কি ভাল হবে আয়না?

আয়না প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, কেন হবে না। এই পুকুরটার ওপারে কাঁদনগাছি। তিন রশি রাস্তা। দিনে দিনে যাব, আসার সময় গাঁয়ের অনেক লোক থাকবে, রসিদও থাকবে।

হাসমত বলল, দেখ আয়না, তোর বয়সটা খারাপ। লোকে নিন্দে করবে। এমনিতেই তো কত কথা শুনতে হয়। তার ওপর যদি আবার কেউ কিছু! ভেবেছিলাম তোর নিকে দিয়ে সব ফয়সালা করব।

আয়না ক্ষিপ্ত সিংহীর মত বলল, আবার নিকের কথা বলছ!

তোমার যদি ভাত দিতে কষ্ট হয় আমাকে বলে দিও আমি আমার রাস্তা খুঁজে নেব।

আমি ভাবছি, আমি মরলে তোর কি উপায় হবে। ভাইরা তোকে যদি খেতে না দেয়! কোথায় গিয়ে দাঁড়াবি। তাই নিকে দিতে চেয়েছি। একটু ভেবে দেখিস।

অনেক ভেবেছি, ভাইরা খেতে না দিলে কি পেট চলবে না। তোমার বাড়িতেও গায়ে গতবে খাটতে হচ্ছে, পীতিবাসীর ঘরেও গায়ে গতরে খাটলে ভাতের অভাব হবে না বা'জান। নিকের স্বামী যদি তালাক দেয় তখন কি হবে। পেটে যদি ছেলে আসে তাদের খোরাক দেবে কে? এখন তো একা আছি চলে যাবে দিন।

আয়না থামল। আবার বলতে থাকে, হায় আল্লা তের বছর বয়স না হতেই তো বিয়ে দিয়েছিলে। আমার হুকুম না নিয়েই বিয়ে। তুমি বললে, লেখাপড়া কি হবে, তার চেয়ে নিজের ঘর সংসার বুঝে নে আয়না। কি ঘর সংসার দিয়েছিলে? হায়! খোদা মালুম। ইনসাল্লা এমন বিয়ে যেন কারও না হয়।

হাসমত আয়নাকে বাধা দিয়ে বলল, লোকটা কবরে। তার নিন্দা করিস না আয়না।

নিন্দা। নিন্দা আমি কবি না। বা'জান, আমার নসীবের কথা বলছি। না জেনে শুনে তোমরা অভিভাবক হয়ে যে লোকটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে তখন তো একবারও ভাবনি, ছেলে কেমন, কি করে। তবুও মেনে নিয়েছিলাম। না মেনে তো উপায় নেই। ঘর করব না বললেই পিঠের চামড়া থাকেনি, তোমার জামাই ছিল জানোয়ার। মানুষের চামড়াটাই ছিল তার দেহে, ভেতরটা ছিল পশুর। বা'জান খাঁটি পশু। সামাদকে বলতাম, চোলাই খাসনি। খোদার কসম, চোলাই খেয়ে মরবি। শোনেনি আমার কথা। জোর করে যদি বলতাম ভাল হও তখন আমার চুলের মুঠি ধরে মাটিতে চেপে ধরত। দম বন্ধ হয়ে মরার সামিল হতে হত। আমার কথা শুনলে নি, মরল বিষ খেয়ে, মদে বিষ, চোলাই মদের বিষে সামাদ

মরেছে। মানুষ হলে কেউ কি চোলাই খেয়ে মরে। তিনটে বছর কাটল না।

হাসমত বলল, তারপরও তো পাঁচটা বছর ঘাড় বেঁকিয়ে বসে আছিস। বললাম, নিকে কর। তা করবি নে, তা করবি কেন? আখেরে কষ্ট আছে। আমি মরলে বুঝবি। ছোট ছোট ভাইরা বড় হয়ে তোকে দূর করে দেবে, তখন বুঝবি।

আয়না কুপিতভাবে, নিকে করলেই তোমার সুখ? তাই তো। তা তো হবেই। ফয়েজ মোল্লার তিন বিঘে জমি আর ইমান আলির নগদ আটশ' টাকা, কোনটা নেবে তাই ভাবছ। তা হবে না বাপজান। নিকে আমি করব না। আর ভাইদের কথা? থাকব গাছতলায়, পীরতলায়, এখনও তোমার বাড়িতে ধান সেদ্ধ করছি, ধান ভানছি, পাটপাটালি খাটছি তখনও তাই করে পেট চালাব। তোমার অত ভাবতে হবে না। আমি তো কচি খুকী নই, সাবালিকা।

হাসমত তবুও থাকতে চায় না। বাধা দিয়ে বলল, তাতেই তো ভয়। লায়েক মেয়ে পা পেছলাতে কতক্ষণ, এই তো সেবার।

আর শুনতে চাই না বাপজান। সোনাতলার হেনা বিবি আমি নই, ঘর ছেড়ে হারিয়ে যাব না শহরে, নোংরা বস্তিতে যাব না বাপজান। রাস্তায় খদ্দের খুঁজে বেড়াব না।

তা ভাল, তবুও বলছি একটু হুঁসিয়ারিতে থাকিস আয়না। যা তবে কাঁদনগাছি। তবে পালা শেষ হলেই চলে আসবি। রসিদ সঙ্গে যাবে। আমি পৈঠাতে বসে থাকব যতক্ষণ তুই ফিরে না আসবি ততক্ষণ পাহারা দেব, বুঝলি।

আয়না সবই বুঝল।

বিকেল বেলায় রসিদের হাত ধরে রওনা দিল।

কিছুদূর যেতেই দেখতে পেল সমসেরপুরের নানা পাড়ার মেয়ে-পুরুষ লাইন দিয়ে চলেছে কাঁদনগাছিতে কেষ্টযাত্রার পালা শুনতে। শহর থেকে অনেক দূরে অজ গ্রামগুলোতে আনন্দ পরিবেশন করার মাধ্যম তো কিছু নেই। সামান্য কিছু আনন্দের গন্ধ পেলেই লোকে

ভিড় করে। গান বাজনা থাকলে তো কথাই নাই, কখনও সখনও শহরের ফেরীওলারা ঘুঙুর পায়ে বেঁধে সওদা বিক্রি করতে এলেও ভিড় করে তারা। নতুন কিন্তু নয় অথচ তাদের কাছে নতুন।

আয়না উৎসাহ বোধ করল। রসিদকে টানতে টানতে বলল, তাড়াতাড়ি চল রে রসিদ।

বসিদ জোবে পা ফেলতে ফেলতে উপস্থিত হল কাঁদনগাছির বটতলায়।

তখন বেশ ভিড় জমেছে। দুটো হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বলছে। মাঝে আসর আর চারপাশে শ্রোতারা বসেছে। আসরের শেষ দিকটায় মেয়ে আব শিশুদেব ভিড়। আয়না রসিদের হাত ধরে চেপেচুপে বসল। তারা পৌঁছবার আগেই কেষ্টযাত্রার পালা শুরু হয়ে গেছে। আয়না মাথা থেকে ঘোমটা নামিয়ে ভালভাবে যখন বসল তখন রাধা-বেশী রমেশ গান ধরেছে,

কানু কহে রাই
কহিতে ডরাই
গোঠে মাঠে ধাই
ধবলী চড়াই মুঁই॥

রাধার গান চলছে, চলছে সেই সঙ্গে নাচ। ঘুঙুর পায়ে চারজন সখী নেচে নেচে গাইতে থাকে,

কানু কহে রাই,

মালিনী রাধার মানভঞ্জন করতে শ্রীকৃষ্ণবেশী কচি মিঞা গান ধরল,

শোন শোন ভানু
না বাজাইও বেণু
কুলবধূ মুঁই
পরাণ উতল হোয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণবেশী কচি মিঞা নেচে নেচে রাধাকে প্রদক্ষিণ করে বার বার গাইতে থাকে, গান শেষ হলেই বাঁশীতে ফুঁ দেয়। বাঁশের বাঁশীতে ফুটে ওঠে পূর্বরাগের সুর।

নৃত্যরতা শ্রীরাধাও প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী থামতেই সে আরম্ভ করল নতুন পদ কীর্তন ঃ

জটিল কুটিলা রতি রঙ্গ জানে
নানা দুখ জাগায় পরাণে
কানু বিন সুখ কেহ না মানে।

শ্রোতারা চিৎকার করে উঠল, মধু মধু !

যুবক যুবতী শ্রোতাদের মনে তরঙ্গ উঠেছে। যেন বসন্তের কোকিল নতুন করে কানের কাছে কুহু ধ্বনি করে আসঙ্গ লিপ্সার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আয়নার মত লায়েক, সধবা, বিধবা ও কুমারী মেয়েদের মনে সবার অজান্তে কিসের শিহরণ জাগিয়ে তোলে, কিসের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কাঁদনগাছি তো দূরের কথা, আশেপাশে দশ বিশ মাইলের মধ্যে এর আগে এমন সুন্দর গীতালেখ্যে রাধাকৃষ্ণের পালা কখনও কেউ শুনেছে বলে মনে করতে পারছিল না। পালা শেষে আসর শূন্য হলে রমেশ তার দলবল নিয়ে নিজের বাড়িতে সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে খাবার ব্যবস্থা করল। সবাইয়ের চোখে মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

সবাই কি যেন বলতে চায়।

বুঁচি সবার ছোট, মুখের রং গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, জান রমেশদা, সবাই বলছে আজকের পালা নাকি সুন্দর হয়েছে।

কারা বলছে।

কেন মেন্তি, লতুদি, ভবেন মাস্টার, অনিলদা, সবাই।

কচির দিকে তাকিয়ে রমেশ বলল, তা হলে আজকের পালা ভালই হয়েছে বল !

গম্ভীরভাবে কচি বলল, ওটা তো গাঁয়ের লোক বলবে। আমি তো কেষ্ট। নিজের প্রশংসা নিজে করতে নেই। তবে কেমন ম্যানেজটা করেছি বল। ম্যানেজারের কাজে কোন খুঁত নেই।

হেউ করে ঢেকুর তুলে কচি বলল, আমি ঘর যাচ্ছি রমশা। আজ তো পূর্বরাগ হল, ভাল করে বিরহ, মিলনের পালা বাঁধ রমেশ। দেখবি চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।

রমেশ হেসে বলল, আকাশে মেঘ দেখা দিলেই হৈ-হৈ থেমে যাবে রে কচি। এবছরে নতুন পালা বাঁধব কিন্তু পালাগান হবে আসছে বছর। বছর বছর নতুন পালা নিয়ে আসরে না নামলে লোকে কি শুনবে। আচ্ছা আজ সবার ছুটি। কিরে শ্যামা পেট ভরে খেয়েছিস তো। তোর পাওনা আট আনা, আর ফাউ চাব আনা, নে। যারা বাড়ি যেতে পারবি না তারা আমার সদরে শুয়ে থাকবি, কেমন!

এখানেই যদি কেষ্টযাত্রাব পালাগান শেষ হত তা হলে কাঁদনগাছির নাম বাইরের মানুষ জানতেই পারত না। রমেশ নিজের সংসারের কাজে মন দিয়েছে। সবাই ফিরে গেছে নিজের নিজের বাড়িতে। একটা বড় কাঠের বাক্সে যাত্রাব পোশাকগুলো ভর্তি করে চাতালে তোলাব কথা চিন্তা করছিল রমেশ এমন সময় কচি এসে বলল একটা খবর আছে দোস্ত।

বমেশ খবর শোনাব আশায় কচির মুখের দিকে তাকাতেই বলল, আমাদের ইদিলপুরের গয়লাবা এক পালা গাইতে বলেছে, যাবি রমেশ!

বমেশ বলল, এবার পালা গাইতে কত খরচ হয়েছে জানিস।

জানি। আরও জানি সব খরচই তুই করেছিস। তুই তো অধিকারী, তুই তো মহাজন।

গয়লারা সব খরচ দেবে।

তা হলে পুরোপুবি যাত্রাব দল করতে হয় বে কচি। আমাদের এটা সখের দল, মরশুমী দল, পাষাণীর বন্যার মত। আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয় আমাদের সখের কেষ্টযাত্রার গান। তারপর খরায় পাষাণীর বুকে যেমন চরা পরে তেমনি চরা পরে আমাদের আনন্দের জোয়ারে যখন চাষের মরশুম আসে।

কচি হেসে বলল, এখনও আকাশে মেঘ দেখা দেয়নি। এখনও কেষ্টযাত্রার মরশুম জিইয়ে রয়েছে। আমি হলাম গিয়ে তোর দলের ম্যানেজার। যা ম্যানেজ করব তা মেনে নিবি, বুঝলি। নইলে কচি তার বাপেরও নয়, মায়েরও নয়। কথা দিয়েছি, খেলাপ করতে পারব না।

বেশ। ওপরের চাতাল থেকে বাদ্যযন্ত্রগুলো নামা। রিহার্সেলের জন্য ডেকে নিয়ে আয় সবাইকে।

কচি আমতা আমতা করে বলল, দেখ রমশা, আমাদের দলের একটা নাম দরকার। হাঁরে রমশা দলের নাম কাঁদনগাছি কৃষ্ণযাত্রা পার্টি রাখলে কেমন হয়!

মন্দ কি। তবে মনে থাকে যেন তুই ম্যানেজার। দলের বায়না নেবার দায় তোর।

শলা পরামর্শ করে কচি বেরিয়ে গেল ছেলেমেয়েদের ডেকে আনতে। ফিরে এসে জানাল, সবই আছে, নেই শুধু নাচের মাস্টার মুরারী। সে গেছে শহরে, কবে ফিরবে কেউ বলতে পারল না। তা হলে? পরোয়া নেই, নাচ শেখাতে তো আর হবে না। যারা পালায় নাচে তারা নাচ রপ্ত করেছে আগেই।

ইদিলপুরের মাঠে আবার বসল কেষ্টযাত্রার পালা। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কাঁদনগাছি কৃষ্ণযাত্রা পার্টির নাম। চিড়ে-দই আর চিনির মণ্ডা পেট ভর্তি খেয়ে পনেরটা টাকা হাতে করে রমেশ ফিরল গ্রামে। মোট বারজনকে এক টাকা করে পারিশ্রমিক দিয়ে দুই টাকা দিল কচিকে।

আমাকে বেশি কেন?

কেষ্ট সেজেছিস এক টাকা, আর ম্যানেজারের এক টাকা।

আর অধিকারীর রইল কি?

অধিকার আর নগদ কড়ি ষোল আনা। ব্যস্‌। আর চাই না, তবে এ বছরের মত এখানেই সাঙ্গ, আবার বর্ষার শেষে আমরা বসব নতুন পালা নিয়ে। কেমন?

সে বছরে আর কোথাও কেষ্টযাত্রার পালাগান হয়নি। রমেশ ও কচি চাষের কাজে মন দিয়েছিল। মেয়েরা ধান রুইতে গেছে, কেউ গেছে শহরে। তাদের কাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যে কোন ভাবে কিছু উপায় করে পেট চালানো তাদের কাজ।

পর পর দুটো বছর পাষাণীর প্লাবনে দেশ ভাসেনি। জমিতে ভাল

পলি পড়েনি। চাষের ক্ষতিও হয়েছে, তবে জলের অভাবে অন্য বার যেমন ফসল নষ্ট হয় এই দুই বছরে ফসলও নষ্ট হয়নি, মোটামুটি পেটের ভাত সবার হয়েছে। এবার পাষাণীর বুকে ঢল নেমেছে। নদীর দুই কিনারায় পলি পড়েছে, চাষীর মুখে হাসি ফুটেছে।

গত দু' বছর কাঁদনগাছি কেষ্টযাত্রার দল মাঝে মাঝে গ্রাম গ্রামান্তরে গেছে তাদের বায়না রাখতে। বায়নার অঙ্কও বেড়েছে, দলের জনসংখ্যাও বেড়েছে। রমেশ ঠিক করেছে নবদ্বীপে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে তার দলকে স্থায়ী করবে। যখন বায়না থাকবে না তখন মহলা চলবে, নতুন পালা রচনা করে পালাগানকে ভালভাবে পরিবেশন করবে।

নতুন পালা নিয়ে রমেশ রিহার্সেল শেষ করে কাঁদনগাছির বটতলায় আবার ঢোল সহরত করে পালাগানের ব্যবস্থা করেছে। এবার যে সব মেয়ে এসেছে তার দলে তাদের মা-বাবার সঙ্গে চুক্তি করে মাসিক বেতন ভিত্তিতে কাজ দিয়েছে। একমাত্র রমেশই রাধার অভিনয় করে জটিলা, কুটিলা, যশোদা, সখী যারা সাজে তারা সবাই মেয়ে। তাদের গ্রামের, আশেপাশের গ্রামের দরিদ্র ঘরের মেয়ে। বাবা-মা দেখছে তার মেয়ের খাওয়া পরার দায় রমেশের, উপরি মাস গেলে সামান্য যা বেতন তাদের দেয় তা দিয়ে তাদের সংসারের অনেকটা ভার লাঘব হয়। মেয়েদের দিক থেকে কোন অভিযোগ কেউ করেনি। তবে বার বছর বয়সের যে সব মেয়ে প্রথম এসেছিল তাদের বয়স অনেক বেড়েছে, সেয়ানা হয়েছে, অনেকে ফিরে গেছে বাবা মায়ের কাছে, কারও কারও বিয়েও হয়ে গেছে। পুরানোদের মধ্যে থেকে গেছে বুঁচি আর লতিকা। মেস্তির যাবার ইচ্ছা ছিল না। তার বাবা জোসেফ জোর করে নিয়ে গেছে। সবাই বলে জোসেফ তার মেয়ে মেস্তিকে বিক্রি করেছে চড়া দামে। নতুন মেয়ে যারা এসেছে তাদের সংখ্যা কম নয়। ছয়জন। সবাই অন্ত্যজ শ্রেণীর নয়। কেউ কেউ উচ্চ বর্ণের দাবীদার।

কাঁদনগাছির বটতলায় এবার চারটে হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। আসরও বসেছে বেশ বড়।

এর আগের বার যা হয়েছে। এবারও তাই হয়েছে। কয়েক শত শ্রোতা রমেশ আর তার দলের প্রশংসা করতে করতে ফিরে গেছে। দলের সবাই পালা শেষে খেয়ে দেয়ে যে যার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। কচি পালা শেষ হবার পর জানিয়ে গেছে আগামীকাল সকালেই সে যাবে নবদ্বীপে বাড়ি ভাড়া করতে। রমেশ অনেকক্ষণ বাইরে বসেছিল। দশমীর চাঁদ ডুবে যেতেই রমেশ উঠে গেল। তার শোবার ঘরের দরজা খোলা ছিল। খাতা কলম নিয়ে রমেশ মাথুরের গানগুলো নতুন করে সাজাচ্ছিল। বুঁচি এক গ্লাশ জল পাশে রেখে একটা প্লেট দিয়ে ঢাকল। তারপর বলল, রমেশদা, এবার শুয়ে পড়।

আর একটু দেরি আছে রে বোন। তুই শুয়ে পড়। আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ব ঠিক সময় মত। কাল সকালে সব প্রস্তুত রাখবি। কচি এলেই আমরা রওনা হব বুঝলি।

আচ্ছা, বলে বুঁচি ফিরে গেল।

রমেশ মগ্ন হল তার কাগজ কলমের রাজ্যে। হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। মাথা নিচু করে রমেশ লিখে চলেছে। হঠাৎ মনে হল কে যেন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দরজার পাশে আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রমেশ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কে, কে ওখানে।

আমি। আমি আয়না গো, আয়না।

রমেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল একটি মহিলাকে, তার মুখ ভাল করে দেখতেও পাচ্ছিল না। প্রশ্ন করল, কে আয়না? কোথায় ঘর? এত রাতে এখানে কেন?

আয়না মৃদু হেসে বলল, অনেক কৈফিয়ত চাও। দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি আয়নাবিবি। সমসেরপুরে ঘর। হাসমত আমার বাপ্। এত রাতে এসেছি রাধিকেমশায়ের সাথে দুটো কথা বলতে।

ভাল করনি।

তা তুমি বলতে পার রাধিকেমশায়। এত রাতে অচেনা মানুষের ঘরে অচেনা মেয়ে এলে সবাই কিন্তু তোমার মত কথা বলে না। তোমাদের গান শুনতে এসেছিলাম গো। খুবই ভাল লেগেছে, তোমার

গলা যা মিষ্টি, কত মিষ্টি তোমার গান, আহা ! নাচটাও। আর বলতে হবে না। তাই তোমাকে দেখতে এলাম। রং মাখানো মুখটা দেখছি, এবার আসল মানুষটাকে দেখতে এলাম।

আসল মানুষ দেখা বড়ই কঠিন। তবে তুমি ভাল কাজ করনি। গাঁ শুদ্ধ লোক এখন ঘুমোচ্ছে। আর তুমি জোয়ান মেয়ে মানুষ হয়ে চুপি চুপি আমার ঘরে এসে ভাল করনি।

অত কথা কেন গো। আমি তো থাকতে আসিনি। চলেই যাব ! শুনলাম তুমি নাকি অধিকারী। তুমিই আবার রাধা !

হ্যাঁ। কি বলতে চাও ?

তোমার দলে তো অনেক মেয়ে দেখলাম। তাদের কাউকে রাধা সাজালে মানাতো ভাল, তুমি বরং কেষ্ট হতে। তোমাকে কিন্তু মানিয়েছিল ভাল, তবে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পুরুষ রাধা বড়ই বেমানান। মেয়ে রাধা পাও না বুঝি !

রমেশ অবাক হয়ে গেল আয়নার কথা শুনে। অযাচিত ভাবে কোন মহিলা উপদেশ দেবার ছলে মাঝরাতে চুপি চুপি এসে তাকে বিদ্রূপ করবে তা ভেবেও পায়নি। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বলল, বুঝলাম, এবাব তুমি যাও।

রাগ করছ রাধিকেমশায় ? আহা রাগ কর না। তোমার দলে সত্যিকার একজন রাধা দবকার। তা হলে দলের জয় জয়কার হবে। তাই ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম তোমার সঙ্গে দেখা করব। বলব আমি যদি রাধা সাজি তা হলে কেমন হয় ? নেবে আমাকে তোমাদের দলে। কি, কথা বলছ না কেন ?

রমেশ অস্বস্তিবোধ করছিল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, তুমি ! তুমি রাধা হবে ? তোমাকে জানি না চিনি না। তারপর একটা হাঙ্গামা হোক। কে এসব ঝামেলা সইবে বলতে পার ! শোন মেয়ে। কার ঘরের বউ তার ঠিক ঠিকানা নেই। যাও যাও। এত রাতে এভাবে এসে ভাল করনি। তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। শেষ অবধি দলটাই উঠে যাবে।

আয়না হেসে উঠল।

তুমি হাসছ?

হাসির কথা বললে কে না হাসে? আমাকে কাজ দেবে না, এই তো। তার জন্য নানা ভনিতা। মেয়ে মানুষ তো! বয়সটাও ভাল নয়, কচি নই। তাই তোমার ভয়। কারও মেয়ে তো বটেই, কারও বউ নয় গো। আমি বেওয়া, মানে সোয়ামী মরেছে।

রমেশ ক্রমেই বিব্রত বোধ করছিল, বিরক্তও হচ্ছিল। এমন মুখরা মেয়ে, কখন যে কি বলে বসবে তার কোন ঠিক নেই। কাগজ কলম সরিয়ে রেখে বলল, কাল কথা বলব। আজ ভাবতে দাও। বড় ঘুম পেয়েছে বিবিজান, তুমি ঘরে যাও। কাল সকালে এস।

আয়না হেসে বলল, দিনের আলোতে চিনতে চাও, পারবে কি চিনতে। আবার কাল আসব, বুঝলে, চিনতে পারবে তো?

যেমন চুপি চুপি এসেছিল তেমনি চুপি চুপি আয়না বেরিয়ে গেল রমেশের ঘর থেকে। দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রমেশও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

সকাল হতেই রমেশের মনে পড়ল আয়নার কথা। তাকে তো আজই আসতে বলেছে কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কেমন একটা আতঙ্ক তার মনে।

সকালবেলায় লতিকার বাবা এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলে গেছে, লতিকার বিয়ে ঠিক করেছে, সে আর দলে থাকবে না।

রমেশ ভেতর বাড়ি থেকে লতিকাকে ডেকে পাঠাল।

সব শুনে লতিকা বলল, আমি যাব না।

কেন? কেন যাবি না লতু?

বাবা ভাল জানে। গতবার বাড়ি গিয়েই বিয়ের কথা শুনেছি। তখনই বলেছি জলুকে আমি বিয়ে করব না।

কেন করবি না?

তুমি তো জান রমেশদা আমাদের অজ গাঁ থেকে গরীব ঘরের মেয়েদের জলু চাকরির লোভ দেখিয়ে শহরে নিয়ে যায়। কেউ কেউ বিয়ে

করেও নিয়ে যায়। তারপর ওদের কোন খোঁজ পায় না বাপমায়েরা। জলু তিনশ টাকা দেবে বলেছে আমার বাবাকে। বাবা আমাকে বিক্রি করবে রমেশদা। আমি কিছুতেই যাব না। তোমার পায়ের তলায় থাকব। যেদিন তুমি তাড়াবে সেদিনই আমার ছুটি।

লতিকার বাবাকে ডেকে বলল, তোমার মেয়ে যেতে রাজি নয় কাকা। তুমি তার সঙ্গে কথা বল, আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি। লতিকা এসেই তার বাবাকে দেখে ক্ষিপ্তের মত বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব না, তোমার মতলব জানি। ওটা হবে না। জলুকে আমি বিয়ে করব না। জোর করলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

লতিকার বাবা ফিরে গেল।

এর মধ্যেই কচি ফিরে এসে খবর দিল, নবদ্বীপে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে।

বাঁধা ছাঁদা করে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দুপুরবেলায় খেয়ে রমেশ মাদুর পেতে খাতাপত্র নিয়ে বসেছে এমন সময় মিষ্টি হাসির সঙ্গে শোনা গেল, এই যে রাধিকেমশায়।

কে আয়নাবিবি! বস।

শুনলাম আজ রাতের পালা গেয়ে কাল সকালেই তোমরা গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সত্যি?

সত্যি তবে কচির সঙ্গে পাকা কথা হয়নি। তার সঙ্গে কথা বলে তবেই ঠিক করব। যদি এদিকে কোথাও বায়না থাকে তা হলে দেরি হবে।

আয়না মাদুরের এক কোণায় বসে বলল, আমার কথা ভেবেছ কি কিছু?

তোমার কথা ভেবেছি আয়না। আমার দলের মেয়েরা অল্পবয়সী। দু-একটা একটু বড়। প্রায় সব মেয়েই আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে চুক্তি করে দলে নিয়েছি। ওরা সাক্ষী রেখে চুক্তিতে টিপ সই দিয়ে টাকা নিয়েছে। কম হোক আর বেশি হোক মাসে মাসে চুক্তিমত টাকাও তাদের ঘরে পৌঁছে দি।

তাদের জন্য চিন্তা করি না কিন্তু তোমার ব্যাপার আলাদা, বয়স বেশি। আর!

আর কি। আমি তো সাবালিকা। আমি সই দেব সাক্ষীর সামনে। টিপ সই নয় গো রাধিকেমশায়। খাস বাংলায় সই দেব। তবে একটা সর্ত রইবে। আমি দলে যোগ দিলেই তুমি আর রাধা সাজতে পাবে না। রাধা হব আমি আর কেষ্ট হবে তুমি। ভাবছ, বেসরমী মেয়ে। নয় গো নয়। দুখীর কোন সরমই সরম নয়, তাকে বেসরমী হয়েই সরম বাঁচাতে হয়। তবে সর্ত না মানলে আমি কিন্তু পালাব। দোষ দিও না কিন্তু।

রমেশ হতভম্বের মত চেয়ে রইল আয়নার দিকে।

বলল, কাল সকালে এস।

কাল তো চলে যাবে।

যাব আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।

পরের দিন খুব সকালে আয়না এসেই ডাকল, রাধিকেমশাই।

তোমারই অপেক্ষায় আছি। সাজগোজ শেষ, সবাই রওনা হবে। সকালবেলায় মালপত্র নিয়ে কচি চলে গেছে।

কোথায় যাচ্ছ এখন?

নবদ্বীপ।

আমার কথা কিছু ভেবেছ কি?

ভেবেছি। কাল তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে দুপুর-বেলায় পুকুর পাড়ে তোমাকে দেখে অনুমান করেছিলাম।

কি অনুমান করেছ রাধিকেমশাই?

তুমি মরেছ। এখনও প্রাণটা বের হয়নি, হাঁকুপাকু করছে। ওরা সবাই আজ চলে যাবে। কাল সকালে আমি যাব। তুমি কাল সকালে এস।

তুমি যে আমাকে তাঁতের মাকু করে তুলছ। বলছ, আজ সকালে

এস, কাল সকালে এস, তা বেশ রাখিকেমশাই, আমার নসীবে কাজ জুটবে কি ?

কাল দেব জবাব। আমাকে ভাবতে দাও আয়নাবিবি।

থাকবে তো। শেষে ফিরতে হবে কি মুখ শুকিয়ে। তুমি খুব চতুর। সবাই যখন চলে যাবে, তুমি শুধু রইবে। আমি আসব, আর তুমি ছোট্ট একটা 'না' বলে পালাবে। আমার কিছু বলার থাকলেও বলার সময় পাব না। তবে তুমিও রেহাই পাবে না। আমিও আয়না-বিবি, কাঁদনগাছির রমেশ পেয়াদাকে খুঁজে বের করবই।

মানে, তুমি আমাদের পেছু নেবে।

দরকার হলে নেব। এখন আমার পালা. দু-চার মাস পর হবে তোমার পালা। তখন তুমি নেবে আমার পিছু। আমার কদর বাড়বে, তোমার কদর কমবে। বুঝলে ? এখান থেকে কোথায় যাবে ?

বললাম তো নবদ্বীপে। সেখান থেকে বায়না খাটতে। আসছে সোমবার পাটাকাটা, পরের শুক্রবার নদীসিকে। সে তো অনেক দূর। আমার শেষ কথা শুনতে অত দূর তো যেতে পারবে না। কালকে এস, তখন তোমাকে বলব। শোন আয়নাবিবি, আমি দু' কথার মানুষ নই, কাল সকালে এস, রোদ উঠলেই আমি রওনা দেব। মনে থাকে যেন।

সবাই চলে গেছে। সংসারের সব কিছু মাকে বুঝিয়ে দিয়ে রমেশ যাবার জন্য প্রস্তুত এমন সময় আয়না এসে দাঁড়াল তার সামনে, তখনও পুরোপুরি সূর্য ওঠেনি।

রমেশ আয়নাকে পাশে বসিয়ে বলল, তোমাকে দলে নেবার ইচ্ছা আছে কিন্তু ভয় পাচ্ছি।

ভয়। হেসে উঠল আয়না। আবার বলল, কিসের ভয় ?

ঢোক গিলে রমেশ বলল, সেই-টেই তো বলতে চাইছি। তুমি মুসলমান ঘরের মেয়ে তাতেও ভয়। তুমি সাবালিকা, তাতেও ভয়। তোমাকে দলে নিতে সাহস পাচ্ছি না। গাঁয়ের মিঞারা দল বেঁধে যদি হুজ্জত করে তখন কে রক্ষা করবে বল। কে সামলাবে ? আমরা

পালাগান করি, আনন্দ পাই, আনন্দ বিলোই, জাতধর্মের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লে জান-মান সব যাবে, লোকে কি বলবে !

আয়না গম্ভীরভাবে বলল, ঠিকই বলেছ। জান রাধিকেমশাই, গরীবের জাত ধর্ম একটাই। আমরা গরীব, আমাদের জাতধর্মের কোন বালাই নেই। আমাকে আমি সামলাব, তোমাকে ভাবতে হবে না, বুঝলে। আর লোক জানাজানি? জানবে কি করে? তোমরা তো দেশ ছেড়ে যাচ্ছ। এখানে তো পালাগান করতে আসছ না। যাবে তো অনেক দূরে, সেখানে আমার হদিস কেমন করে পাবে।

চাষের সময় আমাদের প্রায় সবাইকে আসতে হবে গ্রামে। আমাদের দল তো মরশুমী। গাঁয়ের মাটিতে যে আমাদের নাড়ি পোঁতা রয়েছে, নাড়ির বাঁধন ছেঁড়া যাবে না। তখন সামলাব কি করে?

বলেছি তো, আমি সামলাব। তোমাদের তো বায়নার হিসাব আছে। একটা ঠিকানা দাও। সেই ঠিকানায় পৌঁছাব। আজ থেকে দেড় দু মাস পরে কোথায় থাকবে, কোন পথে যাব তার নিশানা দিয়ে যাও, আমি ঠিক তোমাদের কাছে পৌঁছাব, কেউ জানবে না আয়নাবিবি কোথায় গেছে, কেন গেছে, পরে যদি জানাজানি হয় তা সামলাবার দায়িত্ব আমার। সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। সব কিছুই থিতিয়ে যাবে।

রমেশ বলল, তা হয় না আয়নাবিবি। তুমি গেলেই তো আসরে নামতে পারবে না। তোমাকে শিখতে হবে। গাইতে শিখবে। নাচতে শিখবে তবেই তো তোমাকে আসরে নামানো সম্ভব হবে। চলবে মহলা, তাতেও সময় দরকার হবে।

সে সব তো তোমাদের কাজ। যদি না পারি তাড়িয়ে দিও। পারলে ঠাঁই দিও।

পাকাপোক্ত কাজ করতে হবে আয়নাবিবি। চুক্তিপত্রে সই করতে হবে কজন সাক্ষীর সামনে।

তোমার চুক্তিপত্রটা দাও, সই-করে দিচ্ছি। কোথায় তোমার সঙ্গে

দেখা করব তার ঠিকানা দাও। ঠিক দিনে, ঠিক সময়ে আমি হাজির হব।

রমেশ বুক পকেট থেকে ডায়েরীটা বের করে বলল, দাঁড়াও। বায়নার হিসাবটা দেখে বলে দিচ্ছি। সামনের মাসের, হাঁ সামনের মাসের দশ তারিখে নোনাপুকুরে তিন রাতের বায়না।

নোনাপুকুর কোথায়, কতদূরে ?

তা পঞ্চাশ মাইল তো হবেই। সোজা পাষাণী পেরিয়ে ওপারের পাকা সড়কে তিন চার মাইল গেলেই আঙ্গুলবেবিয়ার হাট, সেখান থেকে যাবে গোপীগঞ্জের ঘাট। নদী পেরিয়ে ওপারে যাবে বাস। বাসের লোককে বললেই নোনাপুকুরের মাঠে নামিয়ে দেবে।

একা যেতে পারব কি ?

এই তো বলেছিলে কাঁদনগাছির রমেশ পেয়াদাকে যেমন করেই হোক খুঁজে বের করবে। আর গোলমেলে রাস্তার ঠিকানা পেয়েই ঘাবড়ে গেলে।

না গো না। নদী পেরিয়ে যদি তোমাদের হদিশ না পাই। রাত বিরেতে আশ্রয় পাব না।

তুমি যদি ঠিক ঠিক তারিখে যাও, গোপীগঞ্জের হাটতলায় আমি থাকব। নদী পেরোলেই আমার দেখা পাবে। সন্ধ্যে অবধি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।

বেশ, তাই হবে।

কিন্তু তুমি যদি না আস তা হলে কি হবে ?

আয়না হেসে বলল, সেটাও তো কথা। যদি না আসি তখন আমার কেষ্ট বাঁশী বাজাতে বাজাতে ফিরে যাবে তার গোকুলে, আর তোমার দলের হবু রাধিকে সমসেরপুরের হাসমত শেখের গুদামঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়বে। দুনিয়ার কাছে যত কর্জ আছে সব শোধ করবে এইভাবে।

রমেশ এতটা আশা করেনি। বুঝল মেয়েটা ভয়ঙ্কর পরিণতিকেও ডরায় না।

বলল, এই রইল পাকা কথা।

আয়না সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, পাকা কথা, পাকা কথা, পাকা কথা।

আর দেরি না করে আয়না মাঠের পথ ধরল। রমেশ তার দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেকটা পথ যেতে হবে। নবদ্বীপ ঘাটের ছোট লাইনের গাড়ি থেকে নেমে রমেশ এগিয়ে চলেছিল ফেরী ঘাটের দিকে। পেছন থেকে হাত চেপে ধরল বুঁচি।

এদিকে এস রমেশদা। তোমার জন্য কচিদা পানসি ভাড়া করে নামুতে রেখেছে! বসে আছে।

বুঁচি রমেশকে টানতে টানতে পানসির কাছে নিয়ে গেল। পানসিতে বসেছিল কচি, সেই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে নতুন আস্তানায়। পানসিতে ভাল করে বসতেই পানসি ছেড়ে দিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করল, সবাই নিরাপদে এসে পৌঁছেছে তো?

বুঁচি বলল, হুঁ।

থাকা খাওয়ার কষ্ট নেই তো।

সবে তো এসেছি। জোগাড় যন্তর করতে কিছু সময় দরকার। অসুবিধা হয়েছে, আরও দু-একদিন হবে। ওসব সামলে নেব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

কচি বলল, তোর অপেক্ষায় ছিলাম রে রম্‌সা। অনেক বায়না। ছ'মাস তো ছুটি নেই দেখছি। পারবি তো সামলাতে!

সামলাবি তুই, তুই তো ম্যানেজার।

দেখ, আমি আর পারছি না। দুটো কাজ এক সঙ্গে করাটা কঠিন। রাতে কেষ্ট, দিনে ম্যানেজার। রাতে খিল ধরে যায় নাচতে নাচতে দিনে ম্যানেজারি করতে ছুটতে এ গাঁ সে গাঁ। তাতেও পায়ে খিল ধরছে, অত মেহনত সহ্য হচ্ছে না।

তোর কষ্ট বুঝতে পারছি। আর দু-একটা মাস অপেক্ষা করতে হবে রে কচি। এবার নবদ্বীপে ঘর নিয়েছি, খুঁজে পেতে তোর প্রক্সি বের করবই। পায়ে আর খিল ধরবে না।

পানসি এসে ঘাটে ভিড়ল।

এখান থেকে কত দূর!

একেবারে গঙ্গার ধারেই মনে হচ্ছে।

কচিদার পছন্দ ভাল, রাধাকৃষ্ণ ভজনা করব, গঙ্গায় নাইব কত বড় ভাগ্য।

পাড়ে উঠতে উঠতে কচি বলল, আচ্ছা বুঁচিকে রাধার পাট দিলে কেমন হয়?

সঙ্গে সঙ্গে বুঁচি বলে উঠল, ওটা আমি পারব না কচিদা। বরং লতুদিকে নিয়ে চেষ্টা কর।

রমেশ বলল, তা হলে তোকে যশোদা হতে হবে।

তাও পারব না। জটিলা-কুটিলা আর সখী। এগুলোই ভাল।

কচি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই তো!

কি বলতে চাস কচি?

সবাই রাধা, যশোদা, জটিলা-কুটিলা আর সখীর কথা ভাবছে। আর বেচারা কেষ্ট! তার কথা কেউ ভাবছে না। কচি মিঞার নাকে দম বন্ধ হচ্ছে সেটা কেউ ভাবছে না।

দেখ কচি, দল করার সময় তুই কেষ্ট হবি বলেছিলি না, এখন পিটটান দিলে শুনব কেন?

আহা! আমি কি পিটটান দিচ্ছি। বলছি, আমার প্রক্সি পেলে বেঁচে যেতাম।

দেখি তোকে বাঁচাতে পারি কিনা।

কথা বলতে বলতে কাঁদনগাছির কৃষ্ণযাত্রা পার্টির নতুন আস্তানায় প্রবেশ করল সবাই। পাশের বাড়ি থেকে সাঁঝের শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছিল। গঙ্গার বুক বেয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউয়ে শির্ শিরিয়ে উঠল সবাই। রমেশ উঠানে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বলল, কই রে লতু, গরম গরম এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা কর। চলতে চলতে হাঁপিয়ে গেছি।

বুঁচি বলল, সব পাবে। আগে উপরে তোমার ঘরে চল।

উপরে নয় রে বুঁচি। নিচে। উপরে থাকবে মেয়েরা। নিচে ছেলেরা। আমার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে না। তক্তপোষ নেই? হবে, হবে। দু-চার দিনেই পাবি। নিচের তলায় তক্তপোষ না হলে থাকা কঠিন। একটা মাদুর আর কাঁথা কম্বল যা আছে নিয়ে আয়। একটু গড়িয়ে নেব।

কদিনের মধ্যেই নবদ্বীপের প্রবাস জীবনকে আপন করে নিয়েছিল সবাই।

আট-দশজনের দলে এখন জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনিশ। তার সঙ্গে রয়েছে দুজন চাকর, একজন রাঁধুনী। চাকরদের একজনের কাজ বাড়ি পাহারা দেওয়া, অপরজন দলের সঙ্গে যায় বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি আসরে বয়ে আনা, ফাইফরমাইস খাটা, বাজার করা ইত্যাদি।

রমেশ মনে মনে ভাবে আর হাসে। কাঁদনগাছির রমেশ পেয়াদারও পেয়াদার দরকার। কেমন যেন তামসিক ব্যাপার। কদিন নবদ্বীপের তীর্থস্থানগুলো ঘুরে ফিরে দেখে রমেশ কিছুটা সুস্থির হবার আগেই সকালবেলায় দুটো গরুর গাড়ি হাজির করল কচি। একটাতে যাবে মালপত্র, অপরটায় যাবে মেয়েরা। মালপত্রের গাড়ির সঙ্গে যাবে কয়েকজন পুরুষ। যাদের জায়গা হবে না তারা হেঁটেই চলবে।

পালাগানের বায়না প্রায় ষোল দিনের বিভিন্ন গ্রামে।

মাঝে কয়েকদিন বিশ্রাম। তারপরই গোপীগঞ্জ পেরিয়ে এক-নাগারে সাত আট দিন বায়না। আরও বায়নার আশা ছিল কিন্তু একা কচির পক্ষে ছোটাছুটি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাকে দম নিতে হচ্ছে। দলের ছেলেমেয়েরাও হাঁপিয়ে ওঠে। যা ছিল সখের দল, তা হয়েছে ব্যবসায়ীক দল। পয়সার পেছন পেছন কচি ছুটছে, কিন্তু রমেশের অতটা ভাল লাগছে না।

বাইরের বায়না শেষ করে নবদ্বীপে ফিরে এলে অবসর সময়ে গঙ্গার কিনারায় গিয়ে বসে। তার মন চলে যায় পাষাণীর কিনারায় তার কাঁদনগাছি গ্রামে। কবে আকাশে মেঘ জমবে, কবে নামবে বৃষ্টি, তারই চিন্তা করে। বর্ষা নামলেই সে ফিরবে গ্রামে, আরও অনেকে

যাবে। যাবে সবাই তাদের বাবা-মায়ের কাছে। সামনের সেই দিনগুলোর কথা ভাবে, আর চুপ করে দেখতে থাকে গঙ্গার বুক ভেসে আসা নৌকাগুলোকে। সন্ধ্যাবেলায় কাঁসর ঘণ্টা খোলের শব্দে সম্বিত ফিরে আসে। ধীরে ধীরে ফিরে আসে আস্তানায়। এসেই সবাইকে জিজ্ঞেস করে বিকেলের জলখাবার তারা পেয়েছে কিনা। তারপর নিজেও কিছু খেয়ে রিহার্সেল দিতে যায়। জীবনটা এক ঘেয়ে নয়, নতুনত্ব আছে, গতি আছে, আনন্দ আছে। মাঝে মাঝে দলের মেয়েদের ঘরোয়া কোঁদলের বিচারও করতে হয়।

কদিন থেকে ভাবছিল কচিকে ছেড়ে দেবে ময়দানে। সে শুধু ব্যবসা বুঝবে। কিন্তু তার বিকল্প তো বর্তমানে অভাব। অভাব পুরোন করার পথটা উন্মুক্তও নয়, সহজও নয়। অপেক্ষা করছে, যদি সত্যি সত্যি আয়না আসে তা হলে তার স্কীম সফল হতে পারে।

মাস কেটে গেল।

নতুন মাসে তল্পিতল্পা বেধে দলবল নিয়ে রওনা হল রমেশ। অজয় পেরিয়ে গোপীগঞ্জ যাবার আগে তুটো দিন রইতে হবে নেওয়াচকে। সেখান থেকে গোপীগঞ্জ হয়ে নোনাপুকুর।

গোপীগঞ্জের ঘাট থেকে সকালবেলার বাসে সবাইকে রওনা করে দিয়ে কচি আর রমেশ রয়ে গেল ঘাটে। তুজনই গিয়ে বসল সামনের চায়ের দোকানে। কেরাসিন কাঠের অর্ধভগ্ন প্রায় বেঞ্চে বসে চায়ের অর্ডার দিল। তাদের চোখ রইল ফেরীঘাটের দিকে। কচি বার বার বলছে, তোর আয়নাবিবি আসবে না রে। আমাদের ঘরের খবর তোদের চেয়ে বেশি জানি। তোদের ঘরের মেয়ে হলে কারও হাত ধরে নিশ্চয়ই আসত। মুসলমানদের ঘরের মেয়ে শুধু মেয়ে, সাহস করে ঘর ছাড়ার হিম্মত তাদের থাকে না। রমেশের যেমন বিশ্বাস, আয়না ঠিক আসবে। কেন? এর জবাব সে খুঁজে না পেলেও এটা তার বিশ্বাস।

মাঝে মাঝেই রমেশ উঠে পায়চারি করছিল। কচিও বেলা বাড়তেই অস্থির হয়ে উঠেছিল।

তুই কি সারাদিন ঘাটেই বসে থাকবি ?

কচির প্রশ্নের উত্তরে রমেশ বলল, কথা দিয়েছি। কথার খেলাপ করতে তো পারি না। বিশেষ করে একটা জোয়ান মেয়ে এতটা পথ যদি সত্যিই আসে আর এসে যদি কাউকে না দেখে তা হলে কি বিপদ হবে বল তো। তুই নোনাপুকুরে চলে যা কচি। ওদের ব্যবস্থাগুলো করতে পারবি।

তুই পেট শুকিয়ে এখানে বসে থাকবি ?

পেট শুকিয়ে থাকব কেন, চিড়ে মুড়ি তো পাওয়া যাবে। তুই এই বাসেই চলে যা।

কচির ইচ্ছা না থাকলেও রমেশের তাগাদায় উঠে পড়ল বাসে। রমেশ বসে রইল সেই অর্ধভগ্ন বেঞ্চটায়। মাঝে মাঝে কাঁচের গেলাসে করে চা খাচ্ছিল। ফেরীঘাটে যারা পারাপার করছিল তাদের মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছিল। ঘোমটা দেওয়া মেয়েদের ভাল করে লক্ষ্য করছিল।

মুড়িটুরি কিছু পাওয়া যায় এখানে ?

পাবেন কর্তা। উই যে গাছতলায় ঝুপড়িটা, যান হোথায়। পেয়ে যাবেন।

রমেশ মুড়ি সংগ্রহ করে এনে চিবোতে থাকে আর চায়ের গেলাসে মাঝে মাঝে চুমুক দেয়। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। বেলা বাড়তে থাকে। আজ রাতে তাদের পালাগান। বিকেলের শেষ বাসে নোনাপুকুর পৌঁছতেই হবে। ক্রমে ক্রমে অস্থির হতে থাকে। চারটের বাসটা ঘাট ছেড়ে চলে গেল। এর পরেই শেষ বাস সাড়ে পাঁচটায়। রমেশের কেমন একটা বিশ্বাস, আসবেই। শেষ বাস অবধি অপেক্ষা করবেই। তারপর তো নিরুপায়।

ফেরী নৌকার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একদল নামছে, আরেক দল উঠছে। ছোট নদী পারাপার করতে বিশেষ সময় দরকার না হলেও প্রতিবারের ফেরীর যাত্রীদের ওপর নজর রাখতে রাখতে শেষ পর্যন্ত হতাশা পেয়ে বসল তার মনে। চা-ওলার কাছে

জেনে নিল শেষ ফেরী কটায় ছাড়ে। সূর্য ডুবলে নদী পারাপার বন্ধ। রাতের বেলায় নদীর ঘাট নির্জন হয়ে যায়।

এবার ফেরী ঘাটে লাগতেই লক্ষ্য করল কয়েকটি মহিলা ঘোমটা দিয়ে ঘাটে নামছে। রমেশ ভাল করে লক্ষ্য করে উৎসাহিত হল। এগিয়ে গেল ঘাটের কিনারায়। এবার আর ভুল হয়নি। আয়নাও ঘাটে পা দিয়ে রমেশকে দেখে উৎফুল্লভাবে এগিয়ে এসে বলল, তা হলে তুমি কথা রেখেছ রাধিকেমশাই।

এত দেরি হল কেন?

কতটা পথ বলত। শেষ রাতে রওনা হয়েছি। একা মেয়ে মানুষ, অজানা জায়গা। গা ছমছম করছিল তবে ভয় পাইনি।

তোমার ভয় ডর নেই তা জানি।

আছে গো আছে। দেখছ এটা কি? বলেই আয়না শাড়ীর তলা থেকে ধারালো খুপড়ি বের করে বলল, এটাই আমার ভরসা। আর উপরে আছেন আল্লাহতালা। পাপ তো করিনি, ভয় পাব কেন, তবে নেহাৎ-ই মেয়েছেলে তাই খুপড়ি ভরসা করে পথে বের হয়েছি। ধর আমার পোঁটলাটা। একটু পানি পাওয়া যাবে। বড়ই তেষ্টা পেয়েছে। পথটা তো কম নয়।

ভাল জল কোথায় পাব জানি না। একটা টিউবওয়েল আছে। তার চেয়ে চা খাও। ঐ যে বাস এসে গেছে। শুকনো গলাতে বাসে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি এস, এটাই শেষ বাস। দাও তোমার পোঁটলাটা।

দুজনে ছুটে গিয়ে বাসে উঠল। কোন রকমে বসার জায়গা করে নিশ্চিন্ত হল।

নোনাপুকুরের মাঠে যখন নামল তখন সূর্য অস্ত যেতে বিশেষ দেরি ছিল না। বাস থেকে নেমে দিক ঠিক করছিল নোনাপুকুর কোন দিকে। পথ চলতি মানুষদের নির্দেশ মত নোনাপুকুর পৌছল ঠিক সন্ধ্যাবেলায়। সোজা তাদের সাজঘরে এসে ডাকল, বুঁচি। তোদের গজেন মাস্টারকে ডেকে দে, আর এক ঘটি জল

আর যদি কিছু খাবার থাকে নিয়ে আয় পেটটা খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে।

গজেন মাস্টারের সঙ্গে কচি এসে দাঁড়াল। ততক্ষণ রমেশ মাদুরে গা এলিয়ে দিয়েছে, আয়না বসেছিল মাদুরের একপাশে। আয়নাকে দেখিয়ে রমেশ বলল, গজেনদা, এই তোমাদের নতুন রাধা। পার্ট মুখস্ত করিয়ে নাচগানেব তালিম দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। এই যে বুঁচি, এনেছিস। দে আয়নাকে। খাও আয়না। শুকনো রুটি আর আলুর শুকনো তরকারি। পেট ভর্তি জল খেয়ে নাও।

আয়নাকে সঙ্গে করে গজেন মাস্টার উঠে গেল।

তোরা এসে রিহার্সেল দিয়েছিলি তো?

হ্যাঁ রমেশদা। কচিদা বলেছে, আজ পূর্বরাগ গাইব। কাল নতুন পালা মাথুর।

ভালই। তিন দিনের বায়না। আরেকটা দিন মানভঞ্জন। বুঝলি?

বুঁচি হেসে বলল, কার মানভঞ্জন করবে রমেশদা, যাকে এনেছ তার?

রমেশ গম্ভীরভাবে বলল, ফাজিল হয়ে গেছিস।

ওরা বলল, রমেশদা ঘাটে বসে আছে নতুন রাধার তল্লাসে। রাধা এসেছে। সহজে তো আসরে নামবে না, তার মানভঞ্জন করে তবেই তো সে চালু হবে। বলেই মুখ টিপে হাসতে হাসতে বুঁচি পালাল।

সে রাতে রমেশই রাধার অভিনয় করল। অভিনয় শেষ হতেই গজেন মাস্টার আয়নাকে নিয়ে বসল ট্রেনিং দিতে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। কাঁদনগাছি কৃষ্ণযাত্রা দলে এই প্রথম রাধার ভূমিকায় নামবে একটা মহিলা আর এতকাল যে রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে হবে কেষ্ট। তাই শেষ রাত অবধি রিহার্সেল চলল।

বিকেলবেলায় গজেন মাস্টার এসে বলল, রমেশ ভাই কোথায় পেলে এমন খাঁটি সোনা। এবার মনের মত গয়না গড়িয়ে নাও।

আয়নাকে ডেকে আনল লতিকা।

রমেশ বলল, পারবে তো ?

আয়না হেসে বলল, পারব গো পারব।

আসরে নেমে তো গুবলেট করে দেবে না ?

ভয় নেই রাধিকেমশাই, এতটা পথ এসে তোমাকে ডোবাব না। আজ তোমার পালা কটায় ?

কালকের মত রাত আটটায়।

অনেক দেরি। আরেকবার মহলা দিয়ে নেব। আর তুমি তো পাশেই থাকবে। ভুলটুল করলে শুধরে নিও। এই ভরসাতে আজ আসরে পা দেব। আমাব মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ ?

এমন রূপ খুব কমই দেখেছি। এমন সুন্দর তোমাব মুখ। বাঁ গালের তিলটা! সত্যিই তুমি সুন্দর।

এর আগে বুঝি আমাব মুখ দেখনি ? তা দেখবে কেন ? তুমি দোকানদার। দোকানদাব সওদা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, খদ্দেরের হাল হকিকত জানার দরকাব হয় না। তবুও তো তোমার প্রশংসা পেলাম। তা হল রাধা যে বিনোদিনী তা বিশ্বাস কর। আমি রাধা হব, আর হব বিনোদিনী।

বলেই আয়না হাসল।

এই হাসির জবাব দিয়েছিল রমেশ ক মাস পরে।

সে রাতে নোনাপুকুর আর আশেপাশের গ্রামের মানুষ মুখে মুখে জেনে গেছে, কেষ্টযাত্রার দলে আজ থেকে রাধা সাজবে একটা মেয়ে। খাসা তার গান, খাসা তার রূপ। পাঁচ সাতটা গ্রাম ভেঙ্গে মেয়ে পুরুষের ভিড় হয়েছে। আট দশটা হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোতে নোনাপুকুরের শীতলা মন্দিরের চাতাল লোকে লোকারণ্য।

সবাই তখন সাজঘরে সাজতে ব্যস্ত।

কচি আজ মুক্ত। তাকে আজ আসরে নাচতে হবে না। সে এখন সব ম্যানেজ করছে। রমেশকে সামনে দেখে বলল, যাই বলিস রম্‌শা, তোর পছন্দ ভাল, আয়নাবিবি রাধা সাজলে তুই কি করবি ?

রমেশ হেসে বলল, ফকিরি নেব। নইলে তোর বদলে আমি কেষ্ট সাজবো, তুই ফকিরি নিবি।

যা বলেছিস। আয়নাকে দেখলে ফকিরকেও ঘর ভাড়া করে সংসারী হতে হবে। বুঝলি।

কচি ফিরে যেতেই বুঁচি এসে কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলল, তোমার নতুন রাধা টিকবে তো? শেষে!

রমেশ হেসে বলল, শেষ কোথায়? এই তো আরম্ভ। এই যে গজেনদা, তোমার নতুন রাধা পারবে তো? যদি ভয় থাকে এখনও সামাল দিতে পারব। আসর মাটি করবে না তো।

গজেন মাস্টার গম্ভীরভাবে বলল, আগেই বলেছি খাঁটি সোনা। খাসা জিনিস, তবে কিছুটা গড়েপিটে নিতে হবে। তবে ভরসা নেই, কতদিন টিকবে কে জানে!

রমেশ চিন্তিতভাবে বলল, দেখি। আশা করছি টিকবে। তবে টেকাবার চেষ্টা তো করতে হবে। সদাচার আর সদ্ব্যবহারটা সেও আশা করবে আমাদের কাছে। আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারিনি। কৃষ্ণকে ভালবেসেই তো রাধিকা আয়ান ঘোষের ঘর ছেড়ে ছিল। কৃষ্ণ প্রেম থাকলে এও থাকবে, কৃষ্ণ প্রেমেই তো এও ঘর ছেড়েছে। এই যে আয়না, তোমার তো সাজগোজ শেষ, পারবে তো মান রক্ষা করতে? ভয় পাবে না তো?

কেন ভয় পাব। পারব, পারব, পারব।

একবারে নতুন, অত লোকের সামনে ফ্রি থাকা খুবই কঠিন। অভ্যাস না থাকলে ঘাবড়ে যেতে হয়।

আজ তো তুমি কেষ্ট, তোমার পাশে আমি রাধা, আমার ভুল ত্রুটি সামলাবে তুমি।

আমার ওপর অত ভরসা রেখ না আয়না। নিজের ওপর ভরসা রেখে কাজে নামতে হবে। আর আমাকে কতটুকুই বা জান!

পেলে এমনা হেসে বলল, জানি গো জানি। তোমার রূপ আর গীত আয়না।াগল করেছে, সে রূপে খাদ থাকে না, গুণেও কলঙ্ক

থাকে না। তাই তোমাকে ভরসা করি। তবে আমার ওপর ভরসা রেখ রাধিকেমশাই। যদি আমার হার হয়, কাল সকালে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাব। বুঝলে।

কথা বলার আর সময় নেই। আসরে বাছকাবরা তখন কনসার্ট বাজাতে আরম্ভ করেছে। ঘণ্টা বাজলেই ছুটতে হবে।

কনসার্ট থামতেই গোপিণীব দল গান গাইতে আসরে এল।

প্রথম গোপিনী জিজ্ঞাসা কবল, রাই কোথায় গো বনলতা?

গোপিনী বনলতা বলল, কদমতলায়। ওই যে আসে শ্যাম।

গোপিনীবা সুর তুলল, ওই যে আসে শ্যাম। ওই যে আসে শ্যাম।

আজ শ্যামসুন্দর রমেশ। বাঁশীতে ফুঁ দিতে দিতে আসরে এসে দাঁড়াতেই বনলতা প্রশ্ন করল, রাই বিনোদিনী কোথায় শ্যাম?

গোপিনীবা কোরাসে সুর ধবল, রাই বিনোদিনী কোথা শ্যাম, রাই বিনোদিনী কোথা শ্যাম?

রাই বিনোদিনীবেশী আয়নাবিবি চঞ্চলা হবিণীব মত চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে বুলিয়ে এসে দাঁড়াল শ্যামেব পাশে।

আয়না গান ধরল ঃ

আয়ান ঘরণী
আমি রাই বিনোদিনী
শ্যাম সায়বে ভাসায়ে এ দেহ
জনম জনম দেখিলুঁ ও তনু
শুনিলুঁ বংশী ধ্বনি॥

রাধার গানের জবাবে রমেশ গান ধবল ঃ

শুন শুন ধ্বনি
কানুরে ব্যাখানি
ক্ষণেক দাঁড়াও তমাল তলে
রাধা মাধব রূপ লহরী ভাসিবে যমুনার জলে॥

কোরাসে উভয়ে ঃ

শ্যাম নাচে, নাচে রাধা
কদম্ব কেশব নাচে, নাচে গোপীগণ
শ্যামের পীরিতি নিরখি জনম অবধি
আকুল রাধার পরাণ ॥

শ্রোতারা আনন্দ ধ্বনি দিল, উচ্চ কণ্ঠে হরি ধ্বনি দিল।

অনেক রাত অবধি পালাগান চলল। মাঝরাতে পালাগান শেষ হতেই জয়ধ্বনি দিয়ে শ্রোতারা ফিরে গেল। আসর খালি। সাজঘরে ফিরে গেছে দলের সবাই।

লতিকা যশোদার পোশাক ছেড়ে একপাশে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে লক্ষ্য করে রমেশ বলল, অমন মুখ বাঁকা করে কেন দাঁড়িয়ে আছিস লতু ?

লতু বলল, না কিছু না। তোমার নতুন রাধা ভালই করেছে আজ। রমেশদা, আমাকে রাধার পার্টটা দাও, দেখবে আমি খুব খারাপ করব না।

রমেশ লতিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর অতি মৃদুকণ্ঠে বলল, এক সময় মনে করেছিলাম, তোকে দেব কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা হল তোর রয়েছে সাধনার অভাব। সাধনা না থাকলে কোন কাজই কোনদিন সাফল্যলাভ করতে পারে না। তোর বয়সটা কম, দেহটা টনটনে, মনটা চনমনে, তোকে দিয়ে হবে না রে লতু। রাধা হতে হলে তোর মনটাকে দ্বাপরযুগের রাধা তৈরি করতে হবে অভিনয়ে। বুঝলি, তা তুই পারবি না।

তুমি একবার পরীক্ষা করেও তো দেখতে পার।

ভেবে দেখব। কদিন পরে বলব।

এবার সবাই ফিরে যেতে চায় নিজের নিজের ঘরে।

সেদিন পালাগানের পর রাতের বেলায় লাইন দিয়ে খেতে বসেছে দলের সবাই। রমেশ তদ্বির করছিল। ঠাকুরকে ডেকে বলছিল কাকে ভাত দিতে হবে, কাকে ডাল দিতে হবে। কার পাতে মাছের

টুকরো পরেনি তাও দেখছিল। হঠাৎ তার নজর পড়ল, লতিকা নেই লাইনে, অনিলও তখন খেতে আসেনি।

কেমন যেন সন্দেহ জাগল তার মনে। তাদের বাসস্থানের পেছনে ছিল আমবাগান। রমেশ ধীরে ধীরে আমবাগানের দিকে এগিয়ে গেল। বেশিদূর যেতে হল না। আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল অনিল আর লতিকা। তাদের গোপন অভিসার ও প্রেমালাপ শুনে ফিরে এল রমেশ।

রাতের শোবার আগে অনিলকে ডেকে নিল তার ঘরে।

আমায় কিছু বলবে রমেশদা?

বলছিলাম লতুর কথা। তুই তো লতুকে খুব ভালবাসিস, তাই না!

অনিল মাথা নিচু করে বলল, হ্যাঁ।

সুখের কথা, তবে তোকে বিয়ে করতে হবে লতুকে। আমার এখানে গোপন প্রেম চলবে না তা হলে আমি দল রাখতে পারব না। এতগুলো মেয়ে নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরছি, গাঁয়ে-গঞ্জের ছোঁড়ারা জানতে পারলে মনে করবে দলের মেয়েরা হল ভাড়াটিয়া, তারা পয়সা পেলেই ছোঁড়াদের পিছু ছুটবে। আমি বলি দল রাখতে হলে সবাইকে সহজ সরল সুন্দর হতে হবে। তোকে বিয়ে করতে হবে লতুকে।

অনিল অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কদিন ভাবতে সময় দাও রমেশদা। তারপর তোমাকে বলব।

রমেশ অনিলকে যেতে বলে চুপি চুপি গেল আয়নার ঘরের দরজায়। আয়নার ঘরে বুঁচি আর শ্যামা থাকে। তখনও তারা গালগল্প করে চলেছে। রাত কতটা তাও তারা জানে না। রাতের ঘুমটা সকালে তারা পুষিয়ে নেয়।

আয়নাকে ডেকে বলল, কাল সকালে আমি বাইরে যাব। তুমি আর কচি দলবল নিয়ে নবদ্বীপ রওনা হবে। বর্ষার দেরি নেই, বায়নাও নেই। আমি কদিন পরে ফিরব নবদ্বীপের বাসায়।

আয়না কিছুই বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে রমেশের মুখের 'দিকে তাকিয়ে রইল। রমেশ ফিস্ ফিস্ করে বলল, লতুর দিকে একটু নজর রেখ। কড়া নজর।

আচ্ছা। বলে আয়না নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলায় গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে মালপত্র নিয়ে রওনা হল কচি। সঙ্গে গেল দলের সবাই। রমেশ আকাশে আলো ফুটবার আগেই চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

নবদ্বীপের জীবনে নতুনত্ব কিছু নেই। ছয় মাস নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সবাই ক্লান্ত। সবাই বিশ্রাম চায়, বিশ্রাম নেবার অফুরন্ত সময়। অনেকেই ফিরে গেল তাদের নিজেদের ঘরে। কয়েক দিনের ছুটি। সারা বর্ষাকালটা চাষীর ছেলেরা কাটাবে চাষের কাজে নিজের গ্রামে, মেয়েরা যাবে তাদের বাপ-মায়ের কোলে. কদিনের ছুটি উপভোগ করতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবাইকে ফিরতে হবে নবদ্বীপের ডেরায়। কচি বের হবে বায়নার খোঁজে, অন্যরা রিহার্সেল দেবে, রমেশ নতুন পালা বাঁধবে।

এবার এখনও কেউ ছুটি পায়নি। ছুটি দেবার কর্তা রমেশ। সে যে কোথায় গেছে কেউ জানে না। ছ'সাতদিন পর রমেশ ফিরে এল।

উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, বুঁচি কোথায় রে।

এই যে রমেশদা। উপরে এস, বাবা, তোমার জন্য কি যে ভাবনা।

এবার ভাবনা তো শেষ। একটু চা কর কচি আর আয়নাকে ডেকে দে।

বুঁচি বলল, আয়না দিদি তো নেই। সে গঙ্গায় গেছে নাইতে। কচিদা গেছে বাজারে মন্টাকে নিয়ে।

রমেশ উপরতলায় উঠে এল। বুঁচি মাদুর পেতে দিয়ে বলল, বস, আমি চা করে আনছি।

হাঁরে বুঁচি, এদিককার খবর ভাল তো। আমি কদিন ছিলাম না, তোদের কোন কষ্ট হয়নি তো?

না রমেশদা কোন কষ্ট হয়নি। তবে অনিলদা তুমি যাবার পরদিন থেকে যে কোথায় গেছে আর ফেরেনি। লতুদি মাঝে মাঝে চুপি চুপি চোখ মুছছে।

রমেশ কোন কথা বলল না।

বুঁচি নেমে গেল চা আনতে। ফিরে এসে দেখল রমেশ একই ভাবে ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন একটা উদাস ভাব।

নিচে কচির গলার শব্দ পাওয়া গেল।

নিচের দিকে তাকিয়ে বুঁচি ডাকল, ও কচিদা ওপরে এস, রমেশদা এসেছে।

রমেশের দিকে তাকিয়ে বলল, চা খাও রমেশদা, ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে।

কাপটা সামনে টেনে নিল দু-এক চুমুক দিয়ে বলল, বেশ সুন্দর হয়েছে। এই যে কচি। এদিকে আয়।

বলা নেই, কওয়া নেই, কোথায় গিয়েছিলি?

দেশে আর অনিলের গ্রামে।

অনিলকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর পাওয়া যাবে না। সময় মত ব্যবস্থা না করলে লতুর সর্বনাশ হয়ে যেত। অনিলের গ্রামে গিয়ে খবর নিয়ে জানলাম, অনিলের বউ আছে, দুটো ছেলেও আছে।

কচি বলল, খুব শয়তান তো। আর কাঁদনগাছির খবর কি?

জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই জেনেছে আয়না নাচুনির দলে গেছে। আর কচি মিঞা নাকি তাকে ঘর পালাবার ব্যবস্থা করেছে। সমসেরপুরের মিঞারা খুবই খাপ্‌পা। ইদিলপুরের মিঞাদের সঙ্গে যে কোন সময়ে হাঙ্গামা হতে পারে, এমন আশঙ্কাও আছে। হিন্দুরা যে রেহাই পাবে তার ভরসাও কম।

নিচে আয়নার গলা শোনা গেল, কই গো রাখিকেমশাই, তুমি নাকি এসে গেছ!

রমেশ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আয়না সবে মাত্র ভিজে কাপড়ে গঙ্গা স্নান করে কলসী কাঁখে করে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভেজা কাপড় এমন ভাবে লেপটে আছে তার দেহে যাতে দেহের ভাঁজগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আয়নার এমন মোহিণী মূর্তি রমেশ কখনও দেখেনি। রং মেখে নানা রং-এর পোশাক আর ঝুটো মুক্তোর মালা পরে যখন রাধিকার অভিনয় করে তখনও এমন সুন্দর তাকে দেখায় না। তাড়াতাড়ি রমেশ ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, হ্যাঁ এসেছি, উপরে এস। বুঁচিকে ডেকে বলল, লতুকে ডেকে আনতো বুঁচি।

বুঁচি নিচে নেমে গেল লতিকাকে ডাকতে। রমেশ ক্ষোভের সঙ্গে বলল, দলটা তুলে দেব রে কচি। তুলে দিয়ে যাব আবার কাঁদনগাছির বটতলায়, বিকেল হলে গিয়ে বসব পাষানীর উঁচু বাঁধে। আমরা দুজন পাশাপাশি বসে বাঁশী বাজাব।

তা হয় না রে রমেশ। এতগুলো ছেলেমেয়ের রুটিরুজি এক কথায় বন্ধ করা যায় কি? এরা তো গাঁয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না। ওদের বাবা-মা তাকিয়ে থাকে আমাদের পাঠানো টাকার দিকে। টাকা বন্ধ হলে ওরা যে না খেয়ে মরবে! বড়ই গরীব ওরা।

কচির কথা শেষ হবার আগেই আয়না এসে ঢুকল ঘরে। শেষের কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, কারা বড়ই গরীব।

কচি বলল, আমাদের দলের ছেলেমেয়ে বেশির ভাগই গরীবের ঘর থেকে এসেছে। তাই বলছিলাম। রমেশ বলছিল, দল ভেঙ্গে দিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে।

আয়না ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল, রাধিকেমশাই মন্দ বলেনি। গরীবের ঘরের ছেলেমেয়েরা ফিরে যাবে তাদের ঘরে। ঘরের সন্তান ঘরে ফিরবে। এতো ভাল কথা কিন্তু রাধিকেমশাই এদের পেটের ভাতের ব্যবস্থাটা কি হবে?

আমি তাই বলছিলাম।

আবার ভেবে দেখ। এই যে লতু এসে গেছে। জান রাধিকেমশাই

লতু কদিন চুপি চুপি চোখ মুছছে, বড় কষ্ট, আমরা বিরহ পালাগান করি। ও দেখছি বিরহের চক্রে পড়েছে।

চক্রের ঘূর্ণি বন্ধ হবে। বলে রমেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শোন লতু। অনিল পালিয়েছে। না পালিয়ে উপায় ছিল না।

লতিকা অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রমেশ বলল, অনিলের সব খবর সংগ্রহ করেছি। তুই আর অনিল আমবাগানে যা বলাবলি করছিলি তাও শুনেছি। অনিলকে বললাম. লতুকে বিয়ে করতে হবে। আমার দলে বেলেল্লাপনা চলবে না। ডুবে ডুবে জল খাওয়া চলবে না। রাধামাধব রক্ষা করেছে, তোর গর্ভে সন্তান আসেনি। আমি তো বাচ্চার বাবাকে খুঁজে বেড়াতে পারতাম না তাই অনিল আমাদের রেহাই দিয়েছে।

কারও মুখে কোন কথা নেই। লতিকার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটকে পড়ছিল।

আয়না বলল, আর কোথায় গিয়েছিলে ?

কাঁদনগাছি গেলাম। সেখানেও হাঙ্গামা। শেফালির বাবা আসছে তাকে নিয়ে যেতে। তের বছর বয়স হয়েছে, বাড়ন্ত গড়ন। তার বিয়ে দিতে চায়। আয়নার গ্রাম তো তোলপাড় হচ্ছে।

আয়নার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বলল, বলেছি, ওটা আমি সামলাব। তোমাদের ভাবতে হবে না।

কচি বলল, ভাবতে হবে আয়নাবিবি। ইদিলপুর আর সমসেরপুর যে কোন সময়ে লড়াইতে নামতে পারে।

সে তো ভবিষ্যতের কথা। যা লতু, আরেকবার গঙ্গা স্নান করে আয়। পাপ ধুয়ে যাবে।

লতিকা রমেশের পা চেপে ধরে বলল, ভুল তো সবাই করে, আমিও করেছি। মাপ করে দিও রমেশদা।

রমেশ হেসে বলল, ভুল তো সবাই করে, আমিও করি। তাই বলে আমার বোনকে শাস্তি দিতে পারি নে ? ওটা তো অপরাধ নয়, বয়সের ধর্ম। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, এটা তো অন্যায় নয় কিন্তু

ভালবাসা যখন কর্তব্য করতে দেয় না তখনই ভয়। সেদিন তোকে বলেছিলাম নিজেকে গড়ে তুলতেও সাধনা চাই। সেই সাধনা তোর নেই। রাধা হতে তুই পারবিনে লতু। আয়নার মত নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবি ?

লতিকা হকচকিয়ে গেল। কোথায় যে তাব ভ্রম তা বুঝে ছুটে গেল আয়নার কাছে। তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই আয়না লতিকার দু' হাত চেপে ধরে বলল, একি করছিস বোন। আমার পায়ে হাত দিতে নেই।

লতিকা নাছোড়বান্দার মত বলল, তোমার পায়ের ধুলো দাও গো দিদি। সবাই বলছে এমন পালা, এমন গান আগে কোন দলই শোনায়নি। এটা হয়েছে তোমার আর রমেশদার কৃপায় আর চেষ্টায়। সকাল-সন্ধ্যা তোমাদের পায়ের ধুলো নিতেই হবে।

আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি দু-একদিনেব মধ্যেই নামবে। বর্ষার দেরি নেই। রমেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনটা তার ছুটে যায় কাঁদনগাছির মাঠে, পাষাণীর বাঁধে। যৌবনের প্রথম কটা বছর আকাশে মেঘ দেখলে লাঙ্গলের ফলা ঠিক কবেছে, চার জোড়া হাল নিয়ে প্রস্তুত থেকেছে। মাটি ভিজলেই চাষে নামার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আবার পাষাণীর জলের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, রোজই পাষাণীকে দেখে এসেছে, কতটা জলবৃদ্ধি হল তার ওপর নজর রেখেছে। বন্যার ভয়ে ডাঙ্গার ওপর আস্তানা গড়ার স্থান ঠিক করেও রেখেছে।

এখনও আকাশে কালো মেঘ দেখলেই রমেশ ছট্‌ফট্ করে।

রুচি এসে বলল, মেঘের ডাক শুনতে পাচ্ছিস তো ?

সবাইকে ছুটি দেব মনে করছি। এখন তো ফি বছরে বাড়ি ফেরে সবাই। বর্ষায় বায়নাও নেই। সেই কার্তিকের শেষে। চাষীর ঘরের ছেলেমেয়ে চাষের কাজেই যাক।

কচি বলল, সবাই তো যেতে চায় না। হর সালে ঘরে ফিরলেও এবার আস্তানা আছে।

যারা যাবে না তারা এই আস্তানায় থাকবে।

সবাই হয়ত যেতে চাইবে কিন্তু আয়নাকে রেখে যেতে হবে। আয়না এখানে থাকলে লোকজনও রেখে যেতে হবে।

তুই থাকবি। আমার দল হল মরশুমী দল। এবার দেখছি স্থায়ী করতে হবে। আয়না তো ঘরেরও নয় ঘাটেরও নয়।

তা হবে কেন? কেষ্টবিহীন রাধা? বাপরে! তুই থাকবি।

তুই যে কি বলতে চাস তা বুঝি।

কচি হেসে বলল, যে ঘর ছেড়েছে তার তো ঘরে ফেরা চলে না। কি করব বল! এই তো আয়না এসে গেছে। ওর কথা ওকেই বল।

আয়না মাদুরে চেপে বসে বলল, কি আর বলব। তোমরা কি ঠিক করলে তাই বল।

কচি বলল, আমরা বলছিলাম, কামাল করেছে আয়নাবিবি। আমরা ভাবতেও পারিনি এত অল্প সময়ে কম ট্রেনিং-এ তুমি যা দেখাচ্ছ তা হাজার বছরেও আমরা করতে পারতাম না। এরপর রমেশ পেয়াদার কেষ্টযাত্রার দলকে কম্‌পিট্ করতে কেউ পারবে। রাধা যেন সাক্ষাৎ রাধা।

আয়না গম্ভীরভাবে বলল, তা বটে কচিভাই। পুরুষ মানুষ লাখ বছরেও মেয়ে মানুষ হয় না। রাধা সাজলেও রাধা হতে পারবে না তোমার রমেশ পেয়াদা।

রমেশ বাধা দিয়ে বলল, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে আয়না। কচিটা তোমার কথার ঝাঁজে পালাল। তবে অসাধ্য সাধন করেছ তুমি। সবাই না জানলেও আমরা তো জানি তুমি মুসলমান। মাঝে মাঝেই ভাবি কৃষ্ণ প্রেম যার নেই তার পক্ষে এমন অভিনয় কি করে সম্ভব। ভাবছি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে কেন মজলে? মনে আবেগ না থাকলে সম্ভব হত না কিছুতেই। আমাকে কেন, সবাইকে তুমি অবাক করে দিয়েছ।

আয়না ভ্রূ কুঁচকে বলল, মুসলমান বুঝি ভালবাসতে জানে না?

প্রেম বুঝি তাদের অজানা। তোমার কেষ্টঠাকুর বুঝি প্রেমের রাজা। রাধা না থাকলে তোমাদের কেষ্টঠাকুরের পেরেম টেরেম ছুয়ো হয়ে যেত, বুঝলে রাধিকেমশাই।

আহা ভুল বুঝো না আয়না। বলছি, হিন্দুর দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম!

তুমি তো মহা বোষ্টম দেখছি। তোমরা তো কামগন্ধহীন প্রেমিক, তাই তোমাদের প্রেম ঢিলেঢালা। আমার প্রেম কৃষ্ণে, হিন্দুতে নয়। সত্যি কথা শোন। শ্রীকৃষ্ণে আমার কোন প্রেম নেই। মানুষের প্রতি প্রেমই হল খোদাতালাব প্রেমলাভের সহজ রাস্তা। আমার কেষ্ট তুমি। তোমাকে ভাল না বাসলে কাউকেই ভালবাসতে পারতাম না। খোদার গজব নসীবে লেখা থাকবে। প্রেমের পাঠশালায় মানুষকে আগে ভালবাসতে শেখায়। তারপর উঁচুতে উঠতে হয়। তারই চেষ্টা করছি।

রমেশ হেসে বলল, কিন্তু বিবিজান!

সঙ্গে সঙ্গে আয়না বলল, বিবিজান মরে গেছে রাধিকেমশাই। আয়না বেঁচে আছে আর আছে তার বুক ভরা ভালবাসা। বিবিজান বলে আমাকে লজ্জা দিও না। তুমি তো বলেছিলে, ক্ষমতা দেয় ঈশ্বর আর ক্ষমতা কাজে লাগায় মানুষ। যে ভাল কাজ করতে পারে না সে পশু, আর যে ভাল কাজ করে সে মহামানুষ। তুমি হাসছ। কেন!

আর রঙ্গরস তত্ত্বকথায় কাজ নেই। এবার বর্ষায় কে কোথায় যাবে তা ঠিক করেছ কি?

সেটাই বলছিলাম কচিকে। তার কথা হল, আয়না কোথায় যাবে?

আয়নার কথা হল, নবদ্বীপ ছেড়ে এই বর্ষায় কোথাও যাবে না। তবে আমাকে যদি কাঁটা মনে কর তা হলে কাঁটা তুলে ফেলতে পার। তবে সামনের চারটে মাস তোমাদের মন্দার মাস। কচির সঙ্গে কথা বলে দেখি। আমি তো একলা পারব না, আরও দু-একজনকে রেখে যেতে হবে।

সেটাও ভাবছি। এবার লতিকাও যেতে চাইবে না। নিতাই যদি থাকে তাকেও বলে দেখব। তবে একজন কাজের লোক আর রাঁধুনীকে রাখতেই হবে।

বাঁচলাম। তবে আয়না তো ভয় পাবার মত মেয়ে নয়। শেষ অবধি সবাই চলে গেলেও ভয় পাই না। একটা কিছু করতে তো হবে।

ওরকম ভাবনা করে লাভ নেই। এবার গাঁয়ে ফিরব মনে করেছি। চাষবাসের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে আসব। আসছে দু-একবছর যদি যেতে না পারি তাতেও যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে আসব।

আয়না হেসে বলল, তোমার মতলব ভাল নয় কেষ্টঠাকুর। আয়নাবিবিকে ফেলে পালাবে তা হবে না। আমিও যাব তোমার সাথে।

সে সাহস আমার নেই। যা দেখেছি সেবার আর শুনেছি তাতে মনে হয়েছে মুসলমান পাড়ায় ঘোঁট পাকাচ্ছে কিছু লোক। আমিই যাব বিপদ মাথায় নিয়ে। ওরা নাকি আমার গলা কাটবে। একটা গোলমাল হতে পারে। সবাই বলছে আয়নাবিবিকে কচি আর রমেশ পেয়াদা ফুসলে নিয়ে গেছে।

আয়না গম্ভীর ভাবে বলল, গরীব মুসলমানের ঘরের তালাকি বিবি আর বিধবা মেয়েদের কোথাও স্থান হয় না রাখিকেমশায়। বাপের ঘরে দুর-ছুর আর সোয়ামীর ঘর তো থাকেই না। সাবালিকা মেয়েরা তোমাদের ঘরের মেয়েদের চেয়ে বেশি আজাদী ভোগ করে। আমরা তো গরীবের ঘরের মেয়ে। আমরা ঘর খুঁজে নেব নিজের ইচ্ছামত। আর ওরা যা বলছে তার সবটাই মিথ্যা। তুমি ভাংচি দাওনি, ফুসলেও আননি, নাচতেও বলনি! তোমার দলে অনেক মেয়ে আছে। তারা কাজ করে মজুরী পায়, আমিও কাজ করি মজুরী পাই। এখন তো সবার ছুটি। আমিও ছুটি পেলে পয়সার ধান্দায় বের হব। ওরা কেউ-ই আমাকে তো খেতে দেবে না।

যেখানে পয়সা পাব সেখানে কাজ করব। গতর খাটিয়ে পয়সা, বদ্ কামের পয়সা নয়। তবুও তোমার কাছে সম্মান পাচ্ছি, ইজ্জত বজায় থাকছে।

মিঞারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

না করলে আমার কি করার আছে। আমার এখন ছুটি। মিঞারা পারে তো নিয়ে যাক না আমাকে মন না বেঁধে দেহটাকে কতদিন বাঁধা যায় বাধিকেমশাই। আমি কারও ঘরের বউ নই, পীরিতের মেয়েমানুষ নই। অন্যের চোখ রাঙ্গানিকে গ্রাহ্য করি না। আর যাইহোক, তোমার দলে তো নোংরামি নেই। যদি কেউ ভাব ভালবাসা করে তা হলে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে দাও। এমন ব্যবস্থা কোথাও আছে কি! শোন কেষ্টঠাকুর। তোমার যাওয়া হবে না তোমাকে আমি যেতে দেব না।

রমেশ অবাক হয়ে গেল আয়নার কথা শুনে!

আয়না জোর দিয়ে বলল, আয়না কারও বন্ধকীমাল নয় বাধিকেমশাই। আয়না তার নিজের। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই সামলাব, তবে দুষ্টলোকের সঙ্গ ভাল নয়। তাই তোমাকে যেতে দেব না।

বুঁচি এসে তাদের কথায় বাধা দিল।

রমেশদা এবার কেউ-ই ছুটি নিতে চায় না। গজেনদা আর হেপাতুল্লা কদিনের জন্য যাবে। গজেনদার মায়ের অসুখ, আর হেপাতুল্লা কেন যেতে চায় বলেনি, বলল, খুব দরকারী কাজ আছে।

বুঁচির রির্পোট পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল রমেশ।

তা হলে ভাল করে রিহার্সেল চলুক। বর্ষা নামুক। হাঁড়ি ভর্তি খিচুড়ি হোক। আর চলতে থাকুক আগামী মাসগুলোর প্রস্তুতি।

এবার বৃষ্টি নেমেছে ভয়ঙ্কর ভাবে। আষাঢ়টা মোটামুটি কাটল শ্রাবণের শেষ থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে গঙ্গার বুকও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। খবর এসেছে গজেন মাস্টারের মা মারা গেছে। ভাদ্রের প্রথমে সে আসবে মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়ে। হেপাতুল্লা এসে খবর দিয়েছে,

পাষাণীর বাঁধ ভেঙ্গে জল ঢুকেছে ধান ক্ষেতে। মেরামতির কাজ চলছে। হেমার বাবা এসেছিল পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে নিতে। তার ইচ্ছা ছিল হেমাকে নিয়ে যায়। রমেশ জানে বাবা-মা মেয়েদের নিতে আসে তাদের বিয়ে ঠিক করে। হেমার সঙ্গে হেমার বাবা গদাধরের কি কথা হয়েছিল তা কেউ জানে না। হেমা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, রমেশদা, বাবাকে বলে দাও আমি বাড়ি যাব না। কিছুতেই যাব না।

রমেশ মৃদুস্বরে বলল, তুই যে ঘেমে উঠেছিস দিদি। ব্যাপারটা শুনতে দে, কি হয়েছে?

ও কথা বলতে পারব না। জান রমেশদা, তিন বছর ধরে পেছনে লেগেছে কেরেস্থানদের জনি দাস। আমাকে বিয়ে করতে চায়। ওটা মানুষ নয়। মাতাল। তাড়ি খায় রোজই। আমি বিয়ে করব না। করব না। বাবা কিছু পেয়ে গেছে নগদ নগদ। তাই এবার জুলুম করছে।

গদাধরকে ডেকে রমেশ বলল, গদাইকাকা হেমা তো যেতে চায় না।

তুমি বললেই যাবে। তুমি ওকে বলে দাও রমেশ।

যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয় তা হলে না যাওয়াটা ভাল। ঘরের মেয়ে বিক্রি করলে তোমার মুখ দেখাবার রাস্তা থাকবে না কাকা। নগদ কিছু পেয়েছ, দুবার তো পাবে না কাকা। মাস মাস হেমার মাইনের টাকা তো পেয়ে যাচ্ছ। তারপর হেমা যদি ভাল ঘরে যায় তা হলে তোমার দুঃখ থাকবে না কাকা। এমন কাজটা কর না কাকা। আমি কিছুই বলতে পারব না। সেয়ানা মেয়ে জোর করে কিছুই করা যাবে না।

গদাধর কট্‌মট্ করে হেমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, আচ্ছা, দেখা যাবে।

কচি সব শুনে বলল, কাজটা ভাল হল না হেমা। তোর বাবার পেছনে লোক আছে। তারা ভাল লোক নয় যে কোন সময় ফ্যাসাদ বাধাতে পারে।

হেমা বলল, বাধালেই হল। আমি সাবালিকা। কারও ঘরের বউ নয়। দেখা যাবে। তুমি বড্ড ভয় পাও কচিদা। আসুক না শয়তানরা। দেখে নেব।

আয়না গিয়েছিল গঙ্গায় চান করতে।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে অথচ ফেরেনি। রমেশ বেশ চিন্তিত ভাবে হেপাতুল্লাকে বলল, দেখ তো হেপু, আয়না গঙ্গায় গেছে এখনও ফেরেনি কেন? এত দেরি কেন হচ্ছে! গঙ্গায় বান ডেকেছে। ভরা গঙ্গায় যাওয়াটা আমার পছন্দ নয়।

হেপাতুল্লা বের হবার আগেই লতিকা এসে খবর দিল আয়নাদি নেয়ে ধুয়ে এসেছে।

কাপড় ছেড়ে আয়নাও হাজির হল।

রাধিকেমশাইয়ের কোন হুকুম আছে কি?

না। দেরি দেখে চিন্তা করছিলাম। ভরা গঙ্গা।

একটু সাঁতার দিলাম। অনেকদিন স্রোতের উল্টো দিকে সাতার দিইনি। দিয়ে দেখলাম।

সারা জীবনই তো স্রোতের উল্টো দিকে সাতরে বেড়াচ্ছ, তাতেও মন উঠছে না।

আয়না হাসল।

হেরে যাইনি কেষ্টঠাকুর। হারবার মেয়ে আয়নাবিবি নয় গো।

বর্ষার শেষে সবাই ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে। রোজই মহলা বসছে। নতুন পালা 'মানভঞ্জন' নিয়ে নতুন করে রিহার্সেল আরম্ভ হয়েছে। কচি বায়নার আশায় দূরের গ্রামে যাতায়াত করছে।

আশ্বিনের শেষ।

কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে কচি হাজির হল নবদ্বীপের আস্তানায়।

কচি এদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এরা বায়না করতে

এসেছে। দর দামটা ঠিক করে নে। গতকালও এসেছিলেন। আমি পাঁচশ' টাকা করে হর রাতের জন্য চেয়েছি, আর দলের সবাইয়ের দু' বেলার খোরাক দেবার কথা আর আলাদা গাড়ি ভাড়া দিতে বলেছি।

আগন্তুক ভদ্রলোকদের একজন বললেন, দামটা একটু বেশি মনে হচ্ছে।

রমেশ তাদের কথার উত্তর না দিয়ে জানতে চাইল তাদের গ্রামের নাম।

তিনবুড়ি। মুর্শিদাবাদের ওপার নয়, এপারেই। সাগরদীঘি নামতে হবে।

কয় রাতের বায়না?

পাঁচ রাতের।

রমেশ বিনীতভাবে বলল, জানেন তো গোটা দলের দৈনিক কত খরচ। এ অঞ্চলে বায়না হলে খরচ কত বেশি। কিন্তু চুক্তি হলে তো যেতেই হবে। সাতাশজনের দল। তাদের মাইনে, জলখাবার, ধোপা নাপিত মেটাতে কত দরকার ভেবে দেখুন। আমরা রাধাকৃষ্ণের নাম প্রচার করি। তাদের লীলাকীর্তন করি। লাভের আশায় নয় কর্তা। তবে শুকনো পেটে তো হয় না, তাই যৎসামান্য আমরা দক্ষিণা নিয়ে থাকি। বাজারটা তো দেখছেন। এতেও কুলোয় না, ঘরে থেকে নগদ কড়ি এনে দল রাখতে হয়। দলের সবাই গুণীলোক, তবে বড়ই গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে। গুণের কদর ক জন করে? যাত্রা থিয়েটার বায়স্কোপে লোকে পয়সা খরচ করে, লীলাকীর্তনে ক জনের অনুরাগ আছে বলুন। শহরে তো নেই, গ্রামই আমাদের ভরসা। গাঁয়ের মানুষ আজও ভক্তি শ্রদ্ধা করে রাধামাধবকে, তাই গাঁয়ে গাঁয়ে লীলাকীর্তন করে বেড়াই।

ভদ্রলোকরা কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললেন, বেশ তাই হবে।

তাহলে কচি চুক্তিপত্রটা তুই করে নে। বারান্দায় বুঁচিকে দেখে রমেশ জিজ্ঞেস করল, হাঁরে বুঁচি, আয়না কোথায় রে?

পুজো করছে।

পুজো ? সে আবার কি ?

তাকেই শুধিয়ে দেখ। ওই তো আয়নাদিদি আসছে।

আয়না বলল, আমার খবর করছিলে ? পুজো করছিলাম।

কি পুজো ?

কেষ্ট পুজো।

রাধা নেই। শুধু কেষ্ট।

হেসে উঠল আয়না।

তোমার এ আবার কি পাগলামি।

পাগলামি ? কি বলছ রাখিকেমশাই। কেষ্ট পুজো না করলে পেতাম কি। তুমি তো কাঁদনগাছি রওনা হচ্ছিলে। যেতে পারলে কি ? ওই কেষ্ট পুজো করি তাই তোমাকে আটক করতে পেরেছিলাম।

ঠাট্টা করছ আয়নাবিবি।

না গো না। নিতাই আর লতিকার কথাটা ভেবেছ কি ? রাত দিন আয়না ভজনা করলে আয়নাতে মুখ দেখবে আসল মানুষ দেখতে পাবে না। তার চেয়ে নিতাই আর লতিকার বে'টা আজ কালেই শেষ কর। ওরা দুজনেই রাজি। আর নিতাই তো ভাল ছেলে, মানাবে ভাল। বাঁধন থাকলে দলও ছাড়বে না।

রমেশ বলল, তা যদি হয় আজ রাতেই কণ্ঠিবদল করে ওদের বিয়ে দিয়ে দেব। কিন্তু তোমাব পাগলামির ওষুধ তো আমার জানা নেই।

পাগলামি। তা বটে। আমি হলাম চার মাসের বোষ্টমী। এই চার মাস কেষ্টকে তো পাশে পাই না। বাকি ক' মাস তো কেষ্টঠাকুরের রাধা সেজে আসর মাতিয়ে তুলি। তখন কেষ্টঠাকুর থাকে আমার পাশে। আর দরকার হয় না কেষ্ট পূজার। তুমি আমার বড় বোষ্টম। তোমার মত পাথরের দেবতার মন পাইনি তাই সোনার কেষ্টকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যদি তার মন পাই। আখেরে নসীব যাচাই হবে, ঠিক কর কার হার কার জিত। দেশের খবর তো পেয়েছ, কেমন ?

হাঁ পেয়েছি।

শোন রাধিকেমশাই। আমি তো আর সমসেরপুরে ফিরে যাব না। সমসেরপুরের করুণা আমার সহ্য হয়নি। বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের ফসল তোলার আগেই সোয়ামি মরল। মরার আগে বলে গেল, তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমি মরলে নিকে করিস। তোর তো বয়স আছে, রূপ আছে। কোন কথা বলতে পারিনি। বলার মত সাহসও ছিল না। মাতাল সোয়ামি নিয়ে বিষের নেশায় ছিলাম, সে বিষ আর খাইনি। খাবও না।

তারপর ?

বাপের বাড়ি ছিলাম। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, মৌমাছির অভাব হল না। ওদের হুলে যে বিষ তাতো জেনেছিলাম তাই সবাই খারিজ। তোমাদের পালা শুনতে গিয়ে তোমাকে দেখলাম, ভাবলাম ! যাক সে সব কথা। আমি মজলেও ধর্ম আমার পথের কাঁটা। তাই ঘর বাঁধার স্বপ্ন আর নেই। তবুও তো তোমার পাশে আছি। এই আমার আনন্দ। না পাওয়ার আনন্দটা যে কত মধুর তা বুঝেছি, শিখেছি।

নমাজ পড়তে জান ?

জানি। পড়ি না। আমার বাপজান বলত, তোকে পাঠশালায় পাঠিয়েছি, মোল্লাদের চোখ রাঙ্গানি গেরাহ্য না করে। তোকে তো কিছুই দিতে পারব না। আমার মত গরীবের ঘরে কি করে তুই পয়দা হলি তা খোদা মালুম। তোকে শুধু বলব, খোদার উপর বিশ্বাস রাখিস, তাতেই খোদার উপাসনা। নমাজ দরকার হয় যখন মনটা উচাটন হয়, বিশ্বাসটা ঢিলেঢালা হয়। খোদা ভরসা করে চলিস, দেখবি সব দুঃখ তোকে সুখের পথে নিয়ে যাবে। যখনই সময় পাবি খোদাকে স্মরণ করিস, নমাজ পড়তে হবে না। বুঝলি।

এতো শান্তির পথ নয়। আরও অশান্তি ডেকে আনবে।

আয়না গম্ভীর ভাবে বলল, কেন ? আমি যে খোদার সৃষ্টি মানুষকে ভালবাসি। যে মানুষকে ভালবাসে তার কোন অশান্তি থাকতে পারে না। ভালবাসা তো বাজারের আলু-পটল নয়। পয়সা

দিয়ে কেনা যায় না। মনের কথা? মন যত চায় তত পায় না। তা বলে ভালবাসা তো মিথ্যে হয় না। যারা তোমার ওপর ব্যাজার তাদের এসব জানা নেই। আয়নাবিবি কোন জাতের নয়, ধর্মের নয়, আয়না খোদার মাল, নিজস্ব সম্পত্তি। আয়না মানে তো জান। যাতে মুখ দেখা যায়। আমার এই আয়নাতে মানুষের মনের ছবি আমি দেখতে পাই রাধিকেমশাই।

তুমি এত কথা শিখলে কোথায়?

কথা তো শিশু শেখে, কথার গাঁথুনি আসে মানুষের নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে। আমাদের উপরি সুবিধা হল আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের অনুভূতি আর জ্ঞানটা তীক্ষ্ণ হয় ছোটবেলা থেকেই। তের বছরের ছেলে আর তের বছরের মেয়ের মনের গতিতে থাকে আকাশ পাতাল ফারাক। তবে আমরা দুর্বল। বিশেষ করে দুর্বলতাব সুযোগ নিয়ে যখন পুরুষরা আমাদের ঘরছাড়া করে তখন আমরা বড়ই অসহায়। যেদিন আমরা আত্মনির্ভরশীল হব সেদিন দুর্বলতাও কাটবে। আমি দুর্বলতাকে জয় করতেই ঘর ছেড়েছি। এতেই বুঝতে পারছ এত কথা শিখলাম কি করে।

কিন্তু!

কিন্তু নেই রাধিকেমশাই। যা সত্য তা চিরকাল সত্য, তা কঠোর হতে পারে, নির্মম হতে পারে, অপ্রীতিকর হতে পারে কিন্তু সত্য কখনও মিথ্যা হতে পারে না। যাক এসব কথা। এবার নিতাই আর লতিকার ঘর বাঁধার ব্যবস্থা কর। তবে ভয় নেই নিতাই অনিল নয়। এবার লতিকা ভুল সংশোধন করেই পা ফেলেছে। ওদের জন্য দোয়া কর, ওদের জীবন সুখেব হোক্।

নিতাই লতিকার কণ্ঠিবদল করে বৈষ্ণবীয় মতে বিয়ের উৎসব শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেছে। নবদ্বীপের বৈষ্ণব চূড়ামণিদের অনেকেই আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিল, তারা আশীর্বাদ করল, হরিনামের আসরও বসেছিল। সব কিছু মিটতে মিটতে রাত কাবার হয়ে এসেছে। নিতাই-লতিকাকে ঘরে তুলে দিয়ে আয়না গেল শুতে।

রমেশ আজকাল কেমন যেন উদাস উদাস ভাবে চলতে চায়। কচি দলের হাল ধরে রেখেছে নইলে ভরাডুবি হতেও পারত।

আয়না জিজ্ঞেস করল, অত কি ভাব রাধিকেমশায় ?

অনেক কিছু ভাবি। খেই পাই না, সমাধানও হয় না।

আয়না হেসে বলল, তুমি ধোপার ছেলে। বাপঠাকুর্দার জমিজিরেতও কম নয়। সব গেলেও ধোপার ভাটি তো বসাতে পার। আমিও তোমার রামী ধোপানী হয়ে কাপড় কেচে পেটের ভাত জোগাড় করতে পারব। ভাবনার কিছু নেই।

ঠাট্টা করছ ?

না গো না, ঠাট্টা নয়। তুমি তো পেটের দায়ে কেষ্টযাত্রার দল খোলনি। সখ হয়েছে, গান বাজনা ভালবাস, তাই দল গড়েছ আনন্দ পেতে আর আনন্দ দিতে।

বোধহয় তাই। এখন ভাবছি দল না গড়লেই ভাল করতাম, দল ভেঙ্গে দেব ঠিক করেছিলাম। এবার দল ভেঙ্গেই দেব।

আয়না গালে হাত দিয়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি বলছ গো ?

বলছি যা মনে মনে করছি। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আর ভাল লাগছে না। বড়ই হাঙ্গামা। এতগুলো লোকের খোরাক জোটান, যন্ত্রপাতি পোশাক-আশাক সংগ্রহ, এসব কি সোজা কাজ।

এসব তো পুরানো কথা। দল ভেঙ্গে দিলে কি হবে জান ? এই সব ছেলেমেয়েরা ঘরেও স্থান পাবে না বাইরেও ঠাঁই পাবে না। এদের কথা ভেবেছ কি ?

তা হলে দলের মালিকানা কচিকে দেব।

এতগুলো লোক কিন্তু তোমার ভরসায় থাকে। যেদিন ওরা জানবে তুমি পাশ কাটিয়েছ সেদিন দলে আর শৃঙ্খলা থাকবে না। ওসব কথা ভুলে যাও রাধিকেমশাই। দলকে কি ভাবে আরও ভাল করা যায় সেই চেষ্টা কর। ভাল ভাল পালা বাঁধ, জোর মহলা দাও। দরকার মত আরও ছেলেমেয়ে জোগাড় কর। নিজের গাঁয়ের নয়, বাহির গাঁয়েরও।

গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের তাঁবেতে রাখা যায়। ভিন্ন গাঁয়ের লোক এলে অশান্তি হবে।

আয়না হেসে বলল, ওটাও তো আনন্দ। অশান্তি আছে বলেই তো শান্তির খোঁজ করি।

কাল যদি সমসেরপুরের মিঞারা হামলা করে?

তাতেও আনন্দ। ওরা আসবে কেন? মেয়েমানুষের খোঁজে? দেহের মাংসগুলো খাবলে খাবলে খাবে? আমি লড়াই করব। লড়াই করতে আমি জানি, কি ভাবছ গো?

ভাবছি তোমার কথা। কি যে বল তার কোন বাঁধন নেই। বাধাও নেই। অতটা কি ভাল?

কুণ্ঠিতভাবে আয়না বলল, এবার মাপ করে দাও। এবার থেকে ভেবে চিন্তে কথা বলব।

রান্নাবান্না হল কি? রান্নাব দায়িত্ব তো লতিকার। তার ঘুম ভেঙ্গেছে কি?

দেখে আসছি।

রমেশ বিব্রত ভাবে বলল, না। ওখানে লতিকা আর নিমাই এখন মশগুল। ওরা নতুন জীবনের স্বপন দেখছে। লতিকা একবার ধাক্কা খেয়েছে। এবাব টাকা না বাজিয়ে ট্যাকে গুঁজবে না। ওখানে গেলে মনে মনে বিরক্ত হবে।

আয়না বলল, বৈষ্ণবের দেশ নবদ্বীপ। অতি সহজ উপায়ে কণ্ঠিবদল করে ওদের ঘর বেঁধে দিয়েছ। এর চেয়ে সুখের কি আছে।

আমাদের সুখের হানি ঘটবে আয়নাবিবি, ওরা বেশিদিন দলে থাকবে না। লতিকাকে আর নাচের দলে রাখা যাবে কি!

যখন বাদ দেবাব সময় হবে তখন তোমাকে বলব। দুজনে কাজ করলেই সংসার পাবে, বাঁচবে। ওরা বেকার হলে না খেয়ে মরবে। এখন যেমন আছে তেমন থাকুক।

বায়নার কাগজ পত্র নিয়ে কচি হাজির।

চুক্তিপত্রগুলো দেখতে দেখতে রমেশ বলল, কেঁচুলির বায়না নিস

না কচি। ওখানে লোক জুটবে বাউলদের গান শুনতে ভিড় করবে সিনেমা আর সার্কাসে। কেষ্টযাত্রা শোনার লোক রইবে না। শূন্য মাঠে পালা জমবে না।

কচি বলল, তা কেন হবে। ওরাও রাধামাধবের নাম করবে, আমরাও করব। দেখতে চাই কারা জেতে কারা হারে। আমরা হার মানব না রমেশ। দেখিস ভিড় সামলাতে পুলিস ডাকতে হবে।

রমেশ যতই নিষেধ করুক কচি বায়না পেলেই তা নিয়ে নেয়। ফেরত দেয় না কাউকে। মাঝে মাঝেই রমেশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কচি বলে, অধিকারী তুই আর আমি ম্যানেজার। তোব কাজ তুই করবি, আমার কাজ আমি করব।

রমেশ আপত্তি করলে আয়না বলে, তুমি তো ভারি মজার কেষ্ট, তোমার আক্কেলটাও দেখছি পাথুরে কেষ্টর মত। দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাস, নড়ন চড়ন চাই, হাত পা জমে পাথর হয়ে যাবে।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে সবাই যখন ক্লান্ত তখনও কচির বায়নার খাতায় দাঁড়ি কমা সেমিকোলন নেই।

মুর্শিদাবাদ পেরিয়ে বীরভূমে প্রবেশ। কদিন বিশ্রাম।

নয়াবস্তিতে পালা শেষ করে বিশ্রাম। কচির নির্দেশ।

সকালবেলায় রমেশ হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় বসেছিল চায়ের আশায়; বসে বসে গুন্ গুন্ করে গাইছিল।

পিয়া যব আওব এ মধু গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।
বেদি করব হাম আপন অঙ্গনে
ঝঞ্চ করব তাহে চিকুর বিহনে॥

আয়না চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পেছনে দাঁড়াল। রমেশ নিজের মনে তখনও গুন্ গুন্ করে পদাবলীর গানের কলি ভাঁজছে। আয়না হেসে বলল, হয়েছে গো রাধিকেমশাই, পিয়ার বিরহ আর সহ্য করতে হবে না। চায়ের বাটি নিয়ে পিয়া

অপেক্ষা করছে। আর কিছু পেটে দেবার ইচ্ছা আছে কি? বেলা যে অনেক হল।

রমেশ হেসে বলল, আর কিছু?

তুমি তো মুখের কথাই শুনতে চাও। মন বলে একটা বস্তু আছে সেটা তুমি ভুলেই গেছ।

না গো না। রজকের ঘরে রজকিণী শোভা পায়, যবনী নয়। লোকে তা মেনে নেবে না। কেউ বলবে না, যবনীর প্রেম নিকষিত হেম। এটা কেউ বলবে না। আমরা সহ্য করলেও মিঞা পাড়ার লোকেরা হুজ্জত করবে। আমাদের মনের কথা মনেই শুকিয়ে যাবে।

কতকাল?

যত কাল নিজেদের সংযত রাখতে পারব। বেচাল হলে আমরা লোকের কাছে ছোট হব, দলের লোক আমাদের ঘৃণা করবে, এটা কি কেউ চায়।

বুঁচি এসে বলল, একটা মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় রমেশদা।

ডেকে নিয়ে আয়। আয়না গেল কোথায়?

মন্দিরে।

আবার! কি করে সেখানে!

দেখতে যায়। ঠাকুরকে দেখতে যায়। মেয়েটাকে ডেকে দিচ্ছি।

একটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এল বুঁচি। বলল, আরও কয়েকজন আছে বাইরে।

তাদেরও ডেকে নিয়ে এস। তা তোমার ঘর কোথায়? কি নাম তোমার?

আমার নাম নয়নতারা। ঘর আমার রাজপুরে। তুমিই তো কেষ্টঠাকুর। কাল রাতে তোমাদের গান শুনেছি। অমনটি আর শুনিনি। তোমার দলে মেয়েছেলের তো দরকার।

আমার তো সব লোকই আছে।

আমরা গাইতে জানি নাচতে জানি ! আমি আর বিমলি, নাম করা নাচনি। নেবে তোমার দলে।

আমার এখানে ঠাঁই নেই নয়নতারা।

কেষ্টযাত্রায় যত বেশি গোপী থাকবে তত বেশি পালা জমবে। আমাদের বিমলি কি বুলছে শোন। তোমার দলের কচি কচি মেয়েদের চেয়ে আমরা অনেক ভাল পারব। একদিন দেখতে তো পার।

দেখলেই তো হবে না। তোমাদেব কটি কজিও চালাতে হবে।

সেটা তোমার দায়।

বুঁচি বলল, গজেনদার কাছে ওদের পাঠিয়ে দাও রমেশদা। মাস্টার যা বলবে তা শুনবে। শোন গো ভাল মানুষের ঝিয়ারিরা। আমাদের নাচ গানের মাস্টারের কাছে চল। মাস্টার যদি তোমাদেব কাজে খুশি হয় তখন আমরা কথা বলব।

বমেশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাচল। এত সহজ উপায়ে সমস্যা মেটানো যায় তা তাব নিজের জানা না থাকলেও বুঁচির মত মেয়ের জানা আছে। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হল।

আয়না এসে সব শুনে বলল, আজকে নয়গো ভাল মানুষের ঝিয়ারিরা। গজেন মাস্টার বেরিয়ে গেছে, কাল সকালে তোমরা এস। সব ব্যবস্থা করে দেব।

নয়নতারা সদলে বিদায় নিল।

বুঁচি জলখাবার নিয়ে এল। বলল, রমেশদা তোমার খাবার।

দে। তুই তো বেশ ডাগর হয়েছিস। এতদিন তোর দিকে তাকাবার সময় পাইনি। ভাল করে ভেবেও দেখিনি।

বুঁচি হাত জোড় করে বলল, দোহাই রমেশদা, আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ব্যথা কর না। আমার কথা ভেবে রাতের বেলাতে ঘুম নষ্ট কর না। আমার মত আমাকে থাকতে দাও।

তোকে দেশে পাঠাব মনে করছি।

আমি যাব না।

কেন ?

তোমাকে তো বলেছি তোমার পায়ের তলায় থাকব। আমার বিধবা মা নিজেই খেতে পায় না। তুমি টাকা পাঠালে তবেই উনুনে হাড়ি চড়ে। তুমি তাড়িয়ে দিলে আমরা কোথায় দাঁড়াব। বাবা বেঁচে থাকতে কোন রকমে চলত। এখন একেবারে অচল। দোহাই তোমার, এ কাজটি কর না।

একা তো সারা জীবন কাটাতে পারবি না।

পারব, পারব। খেটে খাব, অন্যের গোলামি কেন করব।

নিতাই আর লতিকা ঘর করছে। লতিকা কি গোলামী করছে? একটা বছর তো ওরা মিলেমিশে বেশ কাটিয়ে দিল। বোঝাপড়া করে বাস করতে পারবি না?

তেমন পাত্র কোথায় পাবে। সবাই তো তোমার নিতাই নয়, অনিলদার মত লোক অনেক আছে।

কচি বায়না নিয়েছে কয়লা খনি অঞ্চলে। পর পর পনর দিনের ফিরিস্তি। মাঝে দুদিন ছুটি। কিন্তু কচি নিজেই এতে খুশি নয়। রমেশকে বলল, এই এলাকায় বায়না নেওয়া ভাল হয়নি রে রম্‌শা।

রমেশ হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, কেন?

আর বলিস না। খোলা মাঠ, রুক্ষ জমি, কাঁকুরে পথঘাট, কয়লার ঢিপি। লোকগুলো দেখতে ডাকাতের মত, কালো কালো ধুমসো মবদ। চায়ের দোকানে শুনলাম, ওরা যমদূত। আইন মানে না। তাড়ি খেয়ে হৈ-হুল্লোর করে। মেয়েদের টেনে নিয়ে গেলে কারও রক্ষে নেই। এই তো ম্যানেজারবাবু আসছেন।

কয়লা খাদের ম্যানেজার। সুন্দর বাংলো। আশেপাশে কর্মচারীদের বাড়িঘর। একটু দূরেই ধাওড়া। সারি সারি ঘর। একটা পরিবার। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার। সকালবেলা ধাওড়ার মেয়ে পুরুষ গাঁইতি ঝোড়া নিয়ে বেরিয়ে যায় মাটির তলা থেকে

কয়লা কাটতে। সকালবেলার দল ফিরে এলে আরেক দল নামে কয়লা কাটতে। সারা দিন রাত কাজ চলেছে মাটির তলায়। উপর থেকে বোঝাও যায় না কি কর্মব্যস্ততা চলছে মাটির নিচে। প্রতি বছর কোম্পানী ধাওড়ার কুলিদের আনন্দ বিতরণ করতে দুটো একটা অনুষ্ঠান করে। কোন বছর কলকাতা থেকে যাত্রাদল আসে, কোন বছর আসে তাঁবু নিয়ে অস্থায়ী সিনেমা কোম্পানী। সকাল বিকেল রাতে শোনা যায় ভোঁ শব্দ। ধাওড়ার মানুষ সচকিত হয় ভোঁ শুনলেই। তারা প্রস্তুত থাকে কাজে যেতে। ভোঁ শোনামাত্র তারা ছুটতে থাকে।

ম্যানেজারবাবু আসতেই রমেশ উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

আপনাদের কোন অসুবিধা হয়নি তো ?

ম্যানেজারবাবুর কথার জবাব দিল কচি। বলল, আপনার আশ্রয়ে এসেছি। আমাদের ভাল মন্দ দেখার দায়িত্ব তো আপনার। তবে !

তবে কি !

রমেশ বলল, আজ্ঞে আমি অধিকারী। কচিকে চেনেন, আমার দলের ম্যানেজার, তবে কিনা !

খাদের ম্যানেজারবাবু বলল, কি অসুবিধায় ভুগছেন বলুন !

আমাদের মেয়েরা বলছে বায়না বাতিল করতে। তারা এখানে পালাগান করতে ভয় পাচ্ছে।

ভয় পাওয়ার মত কিছু ঘটেছে কি ?

ঘটেনি। তবুও ওরা ভয় পাচ্ছে। তাই বলছিলাম, আমাদের বায়নাটা বাতিল করে দিন।

আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। এমন সময় বায়না বাতিল করা সম্ভব নয় অধিকারী মশায়। খনির কর্মীদের এনটারটেন করতে সরকার টাকা দেয়। আমরা ফোক্ ড্রামার ব্যবস্থা করি প্রতি বৎসর। এটা সরকারী ব্যবস্থা। বায়না বাতিল করলে, কর্মচারীরাও ক্ষেপে উঠবে, সরকারের কাছে হাজারও জবাবদীহি করতে হবে। পালাগান

করতেই হবে। তবে যদি ভয়ের কোন কারণ থাকে সেদিকে আমি নজর দেব। আপনি বলুন মেয়েরা কেন ভয়ে পাচ্ছে।

আমরা এতকাল গ্রামে গঞ্জে পালাগান শুনিয়েছি। দু-চারটে ফচকে ছেলে মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছে। তাদের শায়েস্তা করেছে গাঁয়ের মোড়লরা। ওরা বলছে, ওই সব কালো কালো মানুষগুলো এদেশের লোক নয়. ডাকাতের মত চেহারা, কাল রাতে তাড়ি খেয়ে খুবই হুল্লোর করেছে। ওই সব ধুমসো মরদদের ওরা বিশ্বাস করছে না। যে কোন সময় হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। নির্জন মাঠে এমন ঘটনা ঘটলে রক্ষা করার কেউ থাকবে না।

ম্যানেজারবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ভয়টা অমূলক নয়। তবে আমরা তো মগের মুলুকে বাস করি না। এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। তবে ঘটতেই বা কতক্ষণ। মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি করব। আমাদের সিকিউরিটি গার্ড আপনাদের ক্যাম্প পাহারা দেবে সারা রাতদিন। তাদের হাতে বন্দুক থাকবে। কোন কিছু খারাপ দেখলে গুলি চালাবে। আমি নিজেও রাউণ্ড দেব। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। সময় মত জানালেন সেজন্য ধন্যবাদ। আজ রাতে তো কোন প্রোগ্রাম নেই। কাল প্রোগ্রাম। আপনারা বিশ্রাম করুন।

পরের দিন সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই সবাই সাজগোজ করে প্রস্তুত হচ্ছিল পালাগানের জন্য। রমেশ নিজে তখনও সাজগোজ করেনি। তদ্বির করছিল। তার চোখ পড়ল পাঁচুবালার ওপর। সবাই যখন সাজতে ব্যস্ত তখন পাঁচুবালা একপাশে মুখ ভার করে বসেছিল। তাকে দেখেই রমেশ বলল, কিরে পাঁচু, সবাইয়ের সাজা শেষ। তুই এখানে চুপ করে আছিস কেন?

বাবা এসেছে রমেশদা।

তোর বাবার ক্ষমতা তো কম নয়। শ' দেড়শ' মাইল খুঁজতে খুঁজতে এই কয়লাকুঠীর দেশে হাজির হয়েছে। তা হলে খবর একটা আছে, কি বলিস?

আমাকে নিতে এসেছে।

কেন?

জানি না। তোমাকেই বলবে।

ডেকে দে তোর বাবাকে।

পাঁচু মুখ নিচু করে বলল, আমি কিন্তু যাব না রমেশদা। জান তো দেশের কথা। সেয়ানা মেয়েদের নিয়ে কারবার করে দালালরা। আমাকে ছেড়ে দিও না রমেশদা।

কি করব তা শুনে তোর কাজ নেই। তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।

শ্যামসুন্দর পাঁচুবালার বাবা। খুব বেশি বয়স না হলেও এত শীর্ণকায় যে দেখলে মনে হয় ষাটের ওপর বয়স! রমেশের পাশে এসে বসাতেই রমেশ বলল, এই যে শ্যামাদা। কত দাম পেলে।

অবাক হয়ে শ্যামসুন্দর রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিসের দাম?

পাঁচুকে বিক্রি করার দাম।

দাম টাম কি বলছ ভায়া। ভাল পাত্তর পেয়েছি। মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দিতে তো হবে। চিরটা কাল তো তোমার দলে থাকবে না। থাকা ভাল নয়।

তা বটে। পাঁচু যখন এসেছিল তখন তাব বয়স ছিল ষোল। চার বছব পর তার বয়স কত?

তা এক কুড়ি।

ষোল বছরের পাঁচুকে আমার কাছে বেচতে এসেছিলে নয় কি? অন্যলোক হলে দু একশ' টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে সেয়ানা মেয়েটাকে কলকাতার গলিতে বেচে দিয়ে আসত। আমি কাজ দিয়েছি। কাজ শেখালাম। এখন একটু বেশি দাম পাবে, ভরা যুবতীর দাম বেশি পাবে বইকি। ডাগর মেয়ে, তোমার মেয়ে। আমার বলার কিছু নেই। তুমি তো ছয় বছরের চুক্তি করেছিলে। চুক্তি তোমাকে মানতে হবে। নইলে চার বছরে যত টাকা নিয়েছ সব টাকা ফেরত

দিতে হবে। আরও দু' বছর দেরি করতে হবে। এখন পাঁচুও সাবালিকা। তার মতটা নিতেও তো হবে। পাঁচু যদি যেতে চায় তাকে নিয়ে যেও, তবে আমার টাকাটা দিয়ে যেও। অনেক দাম তো নিশ্চয়ই পাচ্ছ, তবে চুক্তি খারিজ হলে টাকা দেবার দায় থাকবেই।

কিন্তু ভাই রমেশ, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। মেয়েকে আমি বিক্রি করব না। ভাল পাত্তর পেয়েছি। এমন পাত্তর সহজে পাওয়া যাবে না। তুমি দয়া করলে আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি।

পাঁচু খিঁচড়ে উঠল। আমার বিয়ে তোমাকে দিতে হবে না। ছোটবেলায় খেতে দাওনি পেট ভর্তি। এখন পেটের ভাত জুটছে অমনি তুমি 'বাবা' হয়ে মোড়লী করতে এসেছ। তা কর না। যখন বুঝব আমার বিয়ে করা দরকার তখন আমিই তোমাকে বলব। মাসে মাসে এত টাকা দিচ্ছি, কৈ, এক মুঠো ঘরের মুড়ি চিড়ে নিয়েও তো আসনি। দরদ! বদিপিসির হাল করতে চাও। আমি যাব না. যাব না, যাব না। তিন সত্যি।

শ্যাম ক্রোধে ফুলছিল। কিছুই বলতে পারছিল না। উঠবার সময় বলল, বেশ. বেশ, তোর কপালে দুঃখ থাকলে আমি কি করব!

শ্যাম উঠতেই রমেশ, রাতের বেলায় কোথায় যাবে। কয়লা কুঠির দেশে বিপদ হতে পারে যখন তখন। আজ রাতটা থেকে যাও, মেয়ের সেবা নাও। তারপর যেও।

শ্যামসুন্দর বাইরে যেতেই রমেশ জিজ্ঞাসা করল, বদিপিসি তোর কে?

আমার ছোটপিসি। তাকে বিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, ওরা বলল বিয়ে দিয়েছি। বিয়ের পরদিন সেই যে গেল, আর ফেরেনি। কোথায় তার শ্বশুর ঘর, কি কাজ করে জামাই আমরা কেউ জানি না। লোকের কাছে শুনেছি হাটের গরুর মত তাকে তিন হাটে বিক্রি করেছিল ওর সেই সোয়ামি। এইটুকুই শোনা গেছে কিন্তু বদিপিসিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি আজও।

এই যে আয়না। পাঁচুর কথা শুনলে? নে পাঁচু সাজগোজ কর।

লোকটাকে পুলিসে দাও রাখিকেমশাই। আমার বাবা ভেবেছিল আমার নিকে দিলে অনেক টাকা পাবে, নইলে জমিজমা পাবে। খোদাব ফজলে বুঝতে পেরেছিলাম, তাই নিকে দিতে পারেনি। একবার সোয়ামি মরল, তারপর নিকে। নিকেব পব আবার তালাক। তারপর আবার নিকে, আবার তালাক। এই তো কপাল। আমরা যেন গরু ছাগল, পুরুষদেব সম্পত্তি, অস্থাবব সম্পত্তি। যখন তখন হাত বদল হয় পুরুষেব মর্জিতে। ঝাঁটা মাবো। ভাগ্যি তোমাকে দেখেছিলাম। তাইতে পালাতে পেবেছি। ওই বদিপিসির অবস্থা আমারও হতে পারত।

রমেশ গম্ভীব স্বরে ডাকল, আয়না।

কেন গো ?

তাহলে তুমি বেচেছ।

হাঁ গো হাঁ। তুমি মাধব তাই রাধাব লজ্জা নিবারণ করেছ। তুমিই লজ্জা নিবারণ কব পাঁচুরও।

ঠাট্টা করছ ? তোমাব সঙ্গে কথা বলে পারব না।

ঠাট্টা তামাসা নয় গো রাখিকেমশাই, আব কিছু হোক অথবা না হোক, ভক্তিতেই হোক আর অভক্তিতেই হোক তোমার কেষ্টযাত্রা অনেকেরই মানরক্ষা করেছে। খুব কিছু মহৎ নয়, বিরাট নয় কিন্তু অগ্রাহ্য করাব মত নয়। যাও এবাব সেজে নাও, কনসার্ট আরম্ভ হয়েছে। ঘণ্টা পড়তে যা কিছু বাকি।

রমেশ সাজগোজের ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ল।

আয়নাও পেছন পেছন মেয়েদের সাজঘরে গিয়ে ঢুকল।

রাতের অভিনয় শেষে সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। রমেশ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে পাঁচুবালার ওপব।

শ্যামসুন্দর খেয়ে দেয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

মাঝে মাঝে সিকিউরিটি গার্ডেব শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রমেশ কম্বল মুড়ি দিয়ে ক্যাম্পের সামনে একাই বসেছিল।

গাড়ির আলো এসে চোখে পড়তেই উঠে দাঁড়াল।

ম্যানেজারবাবু গাড়ি নিয়ে রাউণ্ড দিচ্ছিল। হেডলাইট এসে পড়েছিল রমেশের মুখে।

ধীরে ধীরে গাড়ি এসে দাঁড়াল রমেশের পাশে। মুখ বাড়িয়ে ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করল, কোন অসুবিধা তো চ্ছে না অধিকারী মশায়?

রমেশ হাত জোড় করে বলল, না স্যার, কোন অসুবিধা হয়নি।

ম্যানেজারের গাড়ি ফিরে গেল।

রমেশ আবার গিয়ে বসল ক্যাম্পের সামনে।

তখনও সকালের আলো ভাল করে ফোটেনি। সেই সকালে পাঁচুবালা বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে দেখল রমেশ ক্যাম্পের সামনে একটা মহুয়া গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। পাঁচুবালা ছুটে গেল ক্যাম্পের ভেতর। ডেকে তুলল সবাইকে।

দেখ গে মজা।

কি মজা?

রমেশদার মজা।

আয়না খেঁকিয়ে উঠে বলল, কি মজা, বল না নেকি।

নিজের চোখে দেখে এস।

চোখ মুছতে মুছতে আয়না ক্যাম্পের সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পেল রমেশকে।

পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আয়না গম্ভীরভাবে বলল, ওঠ গো রাধিকেমশাই। সকাল হয়ে গেছে।

রমেশ চোখ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াতেই বহুকণ্ঠের হাসির শব্দ শুনে হকচকিয়ে গেল। এর মধ্যেই পাঁচুবালা, লতিকা, লক্ষ্মীমণি, রাজুবালা তাকে ঘিরে ধরেছে। পেছনে দাঁড়িয়ে নিতাই আর হেপাতুল্লা।

কি ব্যাপার রাধিকেমশাই। কোন কুঞ্জে রাত কাটাতে গিয়েছিলে? আয়ান ঘোষের ভাড়াটে রাখালরা যে তোমাকে আস্ত রেখেছে, এটাই তো ভাবছি। ওঠ ওঠ বঁধু, বিহানের কাক-কোকিল নানা সুরে গান ধরেছে।

রমেশ সম্বিত যেন ফিরে পেল।

বলল, এত কাক কোকিলের তাড়নায় ঘুমোবার কি উপায় আছে বিন্দেদূতী।

তা ঘর ছেড়ে বাইরে কেন?

রমেশ হেসে বলল, ঘরকে বাহির করেছি, বাহিরকে করেছি ঘর। উপায় কোথায় বিবিজান! সারারাত পাহারা না দিলে বায়না যে ফস্কে যাবে। আরও ছটা দিন কাটাতে হবে এই নির্মক কয়লা কুটীর ময়দানে। গোপীবালাদের সদাই ভয় বস্ত্রহরণের। তলায় বসে আছি তুজনকে দু যোজন পথ দূরে রাখতে।

লজ্জা পেল সবাই।

হেপাতুল্লা ছুটে গেল।

এক বালতি জল আর গামছা এনে রাখল রমেশের সামনে।

পাঁচুবালা নিয়ে এল মাজন।

মন্টি এসে দুখানা মাদুর পেতে দিল। দেখতে দেখতে রাঁধুনী কতকগুলো মাটির ভাঁড় হাতে করে কেটলি ভর্তি গরম চা এনে হাজির করল।

এখনও সরাইয়ের মুখ ধোওয়া হয়নি।

মিঠে শীতের সকালে বাসি মুখে গরম চা অমৃত তুল্য। সবাইকে ডেকে তোল। আজ খোলা মাঠেই সকালের আড্ডা জমবে ভাল। যা পাঁচু তোর বাবাকেও ডেকে নিয়ে আয়।

পাঁচু ঘুরে এসে বলল, বাবা নেই বমেশদা। তার পোঁটলা পুঁটুলিও তো নেই। চলে গেছে।

কখন গেল। আমি তো সারারাত পাহারা দিয়েছি। শেষরাতে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। অনন্তকে ডেকে দে। দেখুক খুঁজে।

না। আর খুঁজতে হবে না। বাবা ঠিক ফিরে গেছে দেশে।

গজেন মাস্টার বলল, যে নিজে হারায় সে হারিয়েই যায় রমেশ। বৃথা অনুসন্ধান।

দেখতে দেখতে ছটা দিন কেটে গেল।

দূরের কাছের ধাওড়ার মেয়ে পুরুষ, আশেপাশের গ্রামের মানুষ। বিশেষ করে মেয়েরা দল বেঁধে এসেছে কেষ্টযাত্রার পালাগান শুনতে। রাতের বেলায় ছোট খাট একটা বাজার বসে আসরের আশেপাশে। চা পান বিড়ির দোকান বসেছে। সেখানে ভিড় জমছে। রমেশের কড়া নজর। দলের কেউ যেন কোন সময়েই চা পান বিড়ির দোকানে না যায়। পালা শেষ হলে ময়দান ফাঁকা হয়ে যায়। অস্থায়ী দোকানগুলোর আলো নিভে যায়। গোটা তল্লাট নিস্তব্ধ। একটু দূরে ম্যানেজারবাবুর বাংলোতে আর কর্মচারীদের আস্তানায় টিম টিম করে বিজলী বাতিগুলো জোনাকির মত জ্বলতে থাকে।

গল্প-গুজব নিয়ে সবাই তখন মশগুল এমন সময় ম্যানেজারবাবুর আর্দালী এসে জানাল অধিকারী মশায়কে সাহেব দেখা করতে বলেছেন। মেমসাহেবের হুকুম।

রমেশ তখন ঘটীটি হাতে করে বেরিয়ে গেছে।

কচিই গেল ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল।

রমেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার কচি? জোর তলব কেন?

সাহেব আর মেমসাহেব অনেক কথাই বললেন, শেষে বললেন, আজকের পালা শেষ করে কাল সকালে তার বাংলোতে রাধাকেষ্ট যেন অবশ্যই যায়। মেমসাহেব গান শুনতে চেয়েছে, খাদানের অনেক সাহেব সুবো আসবে, ইনাম দেবে। তোমার মত জানতে চেয়েছে।

কাল তোর কোন বায়না আছে কি?

কাল নেই পরশু আছে পলাশথলিতে। পলাশথলি অনেকটা পথ। দুপুরেই রওনা হতে হবে। নইলে সময় মত পৌঁছে বিশ্রাম পাব না। এপথে বাস চলে না, গরুর গাড়ির পথ। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে হবে!

কাল সবাই বের হয়ে পড়বি শেষরাতে। তবে দিনের বেলায় বাঁধাছাদা করিস। দুপুরে যেতে হবে না। ম্যানেজার সাহেবকে। খবর দিস, আমি যাব।

আর রাধা ?

আয়নার মতটা নিতে হবে। কারও বাড়ি গিয়ে মজলিশে গান গাওয়া ওর সইবে কি ?

কচি বলল, জেনে নিতে হবে। যেমন মেজাজী মেয়ে, ওর মনের কথা বুঝা ভার। এই তো আয়না এসে গেছে। ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে কাল সকালে গানের মজলিশ বসবে, তুমি যাবে কি রাধিকাবিবি ?

কেষ্ট গেলে রাধাও যাবে, রাই বিনা রাধা, তাতো হয় না মিঞাসাব।

রমেশ বলল, শুনলি তো কচি। আয়নাবিবি খোলসা করে কথা বলে না। হেঁয়ালি আর তামাসা। যা খবর দিয়ে আয় কেষ্টরাধা যুগলে যাবে সঙ্গে যাবে বাজনদার।

.আয়না কুপিত ভাবে বলল, হায়রে আমার প্রেমের ঠাকুর। উনি যাবেন আর আমি থাকব ঘরে। তা কি হয়। বৃন্দাবন অন্ধকার করে উনি মথুরা যাবেন আর আমি বিরহে শিঁটকে থাকব! ওসব দ্বাপরের কথা, কলিতে তা হয় না মিঞাসাহেব। মিঞা যেথায় বিবি সেথায়। তারপর খোদা মালুম।

দুপুরবেলায় খেতে সে উঃ-আঃ করে মেয়েরা খাওয়া বন্ধ করে দিল।

কি হল ?

বড় ঝাল। আজ নিশ্চয়ই হেপাতুল্লা রেঁধেছে।

হেপাতুল্লা দাঁত বের করে হি-হি করে হেসে বলল, হাঁ গো দিদিরা আমিই রসুই করেছি। তবে ঝালটা দিয়েছে রমেশকাকা নিজে ?

সবাই চুপ করে গেল।

হেপাতুল্লা এক খাবলা করে গুড় সবার পাতে দিয়ে বলল, এবার মুখ মিষ্টি করে নাও গো দিদিরা। রাতের পালা নইলে ঝাল ঝাল লাগবে।

দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে সবাই নিজের নিজের বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

কচি তখন হিসাব করতে বসেছে।

কতটা লাভ আর কতটা ক্ষতি হল সাতদিনে তারই হিসাব।

রাতের বেলায় পালাগানের আসরে লতিকাকে দেখতে না পেয়ে মন্টিকে জিজ্ঞাসা করল লতু কোথায় ?

তার শরীর ভাল নেই। এখানে এসে অবধি লতুদি তো আসরে নামেনি।

তা হবে। আমি লক্ষ্য করিনি।

কনসার্ট শেষ হয়ে ঘন্টা পড়তেই রমেশ একদিক থেকে আসরে ঢুকেই গান ধরল ঃ

একে পদ পঙ্কজ অঙ্ক বিভূষিত

কণ্টক জরজর ভেল।

আরেক দিক থেকে আয়না প্রবেশ করে গান ধরল।

তুয়া মুখ দরশন সব মুখ পায় নাহুঁ

চির দুঃখ সব দূরে গেলা

তুহারি মুরলী রব শ্রবণে প্রবেশিল

ছোঁড়লু গৃহ সুখ আশ।

গোপীরা কৃষ্ণরাধাকে বেষ্ঠন করে নাচতে নাচতে গানের কলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে থাকে। দর্শকরা আনন্দ ধ্বনি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাল !

পালা শেষ হল রাত্রি প্রায় এগারটায়।

যাবার সময় ম্যানেজার সাহেব কচিকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দিল আগামী সকালের মজলিশের কথা।

সকালবেলায় গজেন মাস্টার আর তবলচি নিতাইকে নিয়ে রমেশ-আয়না গেল ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে। মেমসাহেব এসে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাল। বাংলোর বৈঠকখানা ঘর চেয়ার দিয়ে সাজানো। নানা বেশভূষায় সেজে- বাইরের অনেক অতিথি এসেছে।

নারী-পুরুষের মোটামুটি ভিড় জমেছে। বাংলোর সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। ম্যানেজারসাহেব সবাইকে সাদরে ডেকে এনে বসাচ্ছেন।

মেমসাহেব এগিয়ে এসে রমেশকে বললেন, আজ আপনারা দুজনেই গান শোনাবেন। দেখছেন তো কত অতিথি এসেছেন। তারা যেন তারিফ করে। এরা তো সবাই সিনেমা, থিয়েটার দেখেন। শহরের বিলাসে নিজেদের মিশিয়ে দেন, আমাদের দেশের সৃষ্টি সংস্কৃতিকে এরা ভুলে গেছেন। ভালও বাসেন না। আজ ওদের ভুল ভাঙ্গাতে হবে অধিকারী মশায়।

আপনি যা আদেশ করবেন তা মাথায় পেতে নেব।

কি গো মা, তুমিও তো শোনাবে?

আমরা দুজনেই কোরাসে গাইব মা।

তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর। আমরা শ্রোতা। বাহবা দেব, তারিফ করব।

রমেশ গজেনকে বলল, তুমি আজ বাঁশী বাজাও গজেনদা। আয়না তুমিই হারমোনিয়াম নাও, আর নিতাই তবলাটা বেঁধে নাও ততক্ষণ।

সবাই ব্যগ্রভাবে চেয়ে রয়েছিল।

হঠাৎ গজেনের বাঁশী তাল তুলল। সঙ্গে সঙ্গে কোরাসে গান ধরল আয়না আর রমেশ ঃ

বারিহীন মৎস্য যথা
বায়ু হীন নয় তথা
গোঁয়ালু দিবস রাতি
বংশীহারা মুই।

তোহে রহল মধুপুর, ব্রজকুল আকুল, গোকুল কলেবর,
কানু কানু করিঝুর॥

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে থাকে দুজনায়। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ। কখন যে গান থেমে গেল তা ঠিক মত সবাই বুঝতেও পারেনি। সহসা ম্যানেজার সাহেব প্রশংসা মুখর হয়ে বলল চমৎকার। চমৎকার।

রমেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, এবার তাহলে আমাদের ছুটি দিন। যন্ত্রগুলো ঠিক করে নে নিতাই। কাল ভোর রাতে আমরা পাড়ি জমাব পলাশথলীতে, অনেকটা পথ। এবার অনুমতি দিন।

ম্যানেজার গৃহিণী বলল, অনুমতি নিশ্চয়ই পাবেন, তবে খেয়ে যেতে হবে।

তাতো হয় না মা। আমার দলের সবার খাওয়া না হলে আমি তো খেতে পারি না। ওরা সবাই যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার সন্তানতুল্য।

ম্যানেজার গৃহিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কতজন?

প্রায় ত্রিশজন।

তাহলে! আমি ভেবেছিলাম, কৃষ্ণ-রাধা বুঝি স্বামী স্ত্রী।

হাসতে হাসতে আয়না বলল, অভিনয় গো মা অভিনয়। শুনলে তো রাধিকেমশাই. লোকে কিভাবে! তবে মা, আমি রাধা, অভিনয়েও রাধা, অন্তরে বাইরে আমি রাধা। শ্রীমতী রাধা কেষ্টঠাকুরের বউ ছিলেন না। ছিলেন আয়ান ঘোষের ঘরণী। আমিও ছিলুম আয়ান ঘোষের ঘরণী, গোকুলের ঠাকুর যেমন পরকীয়া প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন তেমনটা কিন্তু কলির ঠাকুরের নেই।

রমেশ বাধা দিয়ে বলল, জিবে লাগাম দাও আয়না। সব জায়গায় সব কথা বলা যায় না।

এমন সতর্ক নিষেধ উপেক্ষা করে আয়না আবার বলল, জানি গো জানি। আমার আয়ান ঘোষ মরে বেঁচেছে তাই যা রক্ষা। কিন্তু রাধিকেমশাই সবাই যা ভাবে তা তুমি স্বীকার কর না, স্বীকার করলেই লোকের মুখ বন্ধ হয়, আমরাও লজ্জার হাত থেকে বাঁচি। শুনুন মাঠাকরুণ, আমাদের কেষ্টঠাকুর এ যুগের মানুষ নয়, বোধহয় দ্বাপরের তবে কলঙ্ক নেই, মনের মানুষও নয়।

রমেশ বিরক্তির সঙ্গে বলল, হুঁ।

কি হুঁ? দ্বাপরের লোক, না মনের মানুষ?

সবটাই।

রমেশ ম্যানেজার গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে বলল, মাঠাকরুণ। ওর কথা শুনবেন না। বড়ই বাচাল। রাগ করবেন না।

ম্যানেজার গৃহিণী বললেন, রাগ করব কেন। সবাই বড় নিন্দে করে এইসব যাত্রাওলাদের, বিশেষ করে মেয়েদের। এই কথা কাটাকাটির মাঝ দিয়ে অনেক কিছু জানা গেল। আমাদের ভুলও ভাঙ্গল।

রমেশ বলল, এটা আমাদের জয়তিলক। আটদশ বছর ধরে অনেক নিন্দা আর প্রশংসা কুড়িয়েছি। এমনভাবে কপালে জয়তিলক কেউ এঁকে দেয়নি মাঠাকরুণ।

ম্যানেজার গৃহিণী দুটো প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই শাড়িটা রাধিকার পুরস্কার, আর এই চাদরটা অধিকারী কেষ্টর। আপনাদের মঙ্গল হোক্।

সারাদিনটা গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল। কচি দলবল নিয়ে বাঁধা-ছাদা শেষ করে সন্ধ্যাবেলায় হাত-পা ছড়িয়ে বসল। সন্ধ্যার আগেই রাতের খাবার প্রস্তুত করে হেপাতুল্লা আর মন্টি সবাইকে খাইয়ে দিয়ে বাসনপত্র মেজে বাক্সবন্দী করে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাত সাড়ে তিনটেতে সবাই প্রস্তুত হবে। সাড়ে চারটের মধ্যে রওনা দিতে হবে। ক্যাম্পের সামনে মাঠে সন্ধ্যা হতে না হতেই ছয়টি গরুগাড়ি এসে জমায়েত হয়েছে। কিছু কিছু বাক্স ডেক্স গাড়িতে তুলে শক্ত করে বেধে দেওয়া হয়েছে।

রমেশ তার বাঁশীটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা মহুয়া গাছের তলায় বসে ফুঁ দিল বাঁশীতে?

শীতের আমেজ আর বাঁশীর লহরী। রমেশ মশগুল হয়ে গিয়েছিল।

বাঁশীর শব্দ লক্ষ্য করে আয়নাবিবি ধীরেধীরে পেছনে এসে দাঁড়াল। ডাকল, রাধিকেমশাই।

কে? আয়না। তুমি ঘুমোও নি? কাল সকালে আবার বেরুতে হবে। ঘুমিয়ে নাও।

তোমার বাঁশীর সুর আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তোমার বাঁশীর সুরে ঘর ছেড়েছি, আজ রাতেও ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।

ঠাট্টা রাখ। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। বল কি দরকার?

লতুর পেটে ব্যথা উঠেছে।

বিস্মিতভাবে রমেশ প্রশ্ন করল, ব্যথা, বদহজম হয়নি তো?

হ্যাঁ। বদহজমই রয়েছে।

জোয়ানের আরক আছে আমার বাক্সে।

কর্কশ কণ্ঠে আয়না বলল, থাম। পোড়া কপাল তোমার। যা বোঝ না তা নিয়ে বক্‌বক্ কর না। জোয়ানের আরকে ব্যথা কমাতে চাইলে লতুর বিয়ে দিতে কি? নতুন পোয়াতি, তাতো জান। জেনেও ন্যাকা সেজেছ দেখছি।

পোয়াতি তো আমি কি করব?

তুমি হরিনাম জপ করবে। মরণ আর কি। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি। ছেলে হবার ব্যথা। বুঝলে! লতু থেকে থেকে যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাচ্ছে। ডাক্তার ডাকতে হবে, নইলে কোন হাসপাতালে নিতে হবে। তার ব্যবস্থা কর। নইলে মেয়েটা বেঘোরে মারা যাবে।

তাই তো! ছেলে তো সবারই হয়। এমন হাঙ্গামার কথা তো শুনিনি। দাই আসে। ডাক্তার! কোথায় পাব ডাক্তার। তাই তো কি করি বলত। এই শীতের রাতে। বিদেশ বিভুঁইয়ে। মহা বিপদ।

আয়না হাসল। তার মুখ ভাল করে দেখা না গেলেও হাসির শব্দটা কানে এল।

তুমি হাসছ। কচি কোথায়? সে তো দল নিয়ে যাবে।

কচির কথা ভুলে যাও রাখিকেমশাই। শুনেছি খাদানের হাসপাতাল আছে। ম্যানেজার সাহেবের কাছে চল। তাকে অনুরোধ করে যদি কিছু করা যায়। অন্তত একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা তো উনি করে দিতে পারবেন।

রমেশ উত্তেজিতভাবে বলল, নিতাই গাধাটা কোথায়। তাকে

পাঠিয়ে দাও। কি মুস্কিল! ডাক্তার। হাসপাতাল। নতুন পোয়াতি। কাল আবার পলাশথলির বায়না। যাও আয়না, তোমরা লতুর কাছে যাও। নিতাইকে পাঠিয়ে দাও। নিতাইকে নিয়ে আমি ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে যাব।

উঁহু। নিতাইকে ডেকে আনছি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।

কেন? বরং তুমি লতুর কাছে থাক।

তার কাছে থাকার লোক আছে। অধিকারীর পাশে থাকার লোক নেই।

সে তোমার ইচ্ছা, নিতাইকে ডেকে নিয়ে এস। শীগ্‌গীর যাও। বেশি রাত হলে ম্যানেজার সাহেবকে ডেকেও তুলতে পারব না। সাহেব লোক কখন কেমন মেজাজ থাকে কে জানে।

আয়না ছুটে গিয়ে নিতাইকে ডেকে আনল। মেয়েদের বলে এল লতুর দিকে নজর রাখতে।

তিনজনেই গেল ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে।

তাদের অভ্যর্থনা জানাল তিনটে কুকুর। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে জানালা খুলে মুখ বাড়াল ম্যানেজার গৃহিণী। হঠাৎ জ্বলে উঠল গোটা বাড়ির আলোগুলো।

কে ওখানে? ওঃ আপনারা? কি দরকার? সাহেব তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভীষণ বিপদ মাঠাকরুণ। সাহেবকে একবার ডেকে দিন।

দেখছি, আপনারা দাঁড়ান।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ম্যানেজার সাহেব এসে দাঁড়াল বারান্দায়। ম্যানেজার গৃহিণী তার পাশে। আর্দালী শিউচরণ গেট আগলে দাঁড়াল।

সব কিছু বিবৃত করে বলতেই ম্যানেজার গৃহিণী বললেন, তাই তো! বিপদ গুরুতর। শোন, তুমি গাড়িটা বের করে রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দাও। আর পোশাক বদলাতে হবে না। এসব

ব্যাপারে দেরি করলেই বিপদ ঘটে। ড্রাইভার দরকার নেই। নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাও।

ম্যানেজার সাহেবের গাড়িতে লতুকে নিয়ে নিতাই, আয়না আর রমেশ কোলফিল্ডের হাসপাতালে পৌঁছে গেল। ম্যানেজার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে লতুকে লেবার রুমে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, এখানে দু-একজন থাকা দরকার।

রমেশ আয়নাকে বলল, তুমি মেয়েদের অবস্থা ভাল বুঝবে। তুমি থাক। আর নিতাই তুই থাক। একজন পুরুষ না থাকলে ছোটাছুটি করার লোক পাওয়া যাবে না।

তুমি ফিরে যাবে ?

হাঁ। কাল রাতে পলাশথলির বায়না। সবাইকে শেষরাতে রওনা করে আমি ফিরে আসব। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

ম্যানেজার সাহেব রমেশকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বলল, যদি অসুবিধা হয় আমাকে খবর দেবেন।

হাসপাতালের বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে নিতাই আর আয়না বসে রইল।

নিস্তব্ধ পরিবেশে হাসপাতাল। কাছেই বড় খাদানের কাজ চলছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু শব্দ কানে ভেসে আসছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে মিটমিটে আলো জ্বলছে, ধীর পদক্ষেপে নার্সরা চলাচল করছে।

আয়না ফিস্ ফিস্ করে বলল, ঘুমোস না নিতাই। তুই ঘুমিয়ে গেলে তোর পিণ্ডি দেবার লোক পালিয়ে যেতেও পারে।

তোমার যা মুখ আয়নাদি।

এখন আয়নাদিকে তেতো লাগছে, তাই নারে মুখপোড়া। আয়নাদি না থাকলে বউটা পেতি ? তোদের রমেশদা যা লোক, বলত আমার দলে বেলেল্লাপনা চলবে না, বুঝলি। তারপর বিদায়। তারপর তুই যেতি উত্তরে আর লতু যেত দক্ষিণে। সারা জীবনে চোর কামারে আর দেখা হত না। তখন আয়নাদি ছিল বড়ই মিঠে।

পায়ে ধরছি আয়নাদি। তোমার সব কথাই সত্য। তুমি ছিলে বলেই তো আজ!

আজ কিরে ড্যাকরা? পায়েটায়ে ধরা আমার পছন্দ নয়।

কে যেন বারান্দা দিয়ে এদিকে আসছিল। ছায়া দেখা গেল। হুজনেই চুপ করে গেল।

গাড়ি থেকে নেমেই দেখে ক্যাম্প শুদ্ধ সবাই হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই সব জিজ্ঞাসা করল, লতু কেমন আছে রমেশদা। এখনও ভাল আছে। কাল সকালে খবর পাব। নিতাই আর আয়নাকে রেখে এলাম। বলে এলাম দরকার মত ওষুধপত্তর আনা, সেবা করা তাদের কাজ। বেলা হলে চাট্টি, মুড়ি চিড়ে যেন খুঁজে নেয়। তোদের রওনা করে আবার যাব ওদের খবর নিতে। সেখানে থেকে পলাশথলি যাব।

বুঁচি চুপি চুপি বলল, একটা মজা হয়েছে রমেশদা!

আবার ব্যাপার। ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। বল কি হয়েছে?

পাঁচু, তোমার আদরের পাঁচু। সকালবেলায় তোমরা যখন ছিলে না তখন একটা হঠাৎ বাবুগোছের লোক এসেছিল, আয়নাদিদিকে খুঁজছিল। সামনে পাঁচুকে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের রাধা কোথায় গো।

পাঁচু খেকিয়ে উঠে বলল, রাধা! সেতো শ্যামের সঙ্গে বেন্দাবন গেছে, কেন?

তাকে একটু দেখতাম।

জানতো পাঁচুবালার আর আয়নাদিদির মুখে কিছু বাধে না। পাঁচুবালা গালে হাত দিয়ে বলল, তাই বল। তুমি সোহাগ জানাতে এয়েছ। তা বাপু, রাধা বড় মানিনী, সোহাগ তার সহ্য হয় না।

রমেশ জিজ্ঞেস করল, তারপর?

একটা শাড়ি হাতে করে এসেছিল লোকটা। কি যেন নাম ভীম, না ভীষ্ম। শাড়িখানা রাধাকে দেবার বড় ইচ্ছা।

রমেশ বলল, রেখে দিলেও পারতি।

আমি কি ছিলাম। শুনলাম পরে। আমরা তো আয়নাদিকে চিনি। রেগে কাঁই হয়ে যেত। তার চেয়ে পাঁচু যে বুদ্ধি করে ফেরত দিয়েছে সেটাই ভাগ্যি। কার কি মতলব, কে জানে।

দিনের বেলায় খারাপ মতলব নিয়ে এলেও তো নিস্তার পেত না। যাক্, তোরা ঘুমিয়ে নে। সকালের রোদ উঠবার আগেই তোরা রওনা হবি। লতুর হাঙ্গামায় আমার একটু দেরি হবে বই কি। নে যা!

সকালবেলায় দুর্গানাম জপতে জপতে রমেশ রওনা হল হাসপাতালের পথে। যাবার সময় কচিকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বলল, তোরা পলাশথলি পৌঁছবার দু-তিন ঘণ্টা পর আমরা পৌঁছে যাব. নিতাইকে হাসপাতালে রেখে আয়নাকে নিয়ে আমি ঠিক সময় মত পৌঁছাব, বুঝলি। মালপত্র তোলা হয়ে গেছে, এবার মেয়েরা যেন গাড়ির ছইয়ের ভেতর বসে। মন্টি আর হেপাতুল্লা গাড়ির আগে পেছনে পাহারা দিয়ে যেন নিয়ে যায়।

হাসপাতালের দরজায় পৌঁছে রমেশ কাউকে দেখতে পেল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল বার বার। নার্সদের কোয়ার্টারের দিক থেকে একটা ঘোমটা টানা মহিলাকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল। হয়ত হাসপাতালের লোক। এর কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে। মহিলাটি এগিয়ে এসে ঘোমটা নামিয়ে দিল মুখ থেকে, রমেশ অবাক হয়ে দেখল, আয়না!

আয়নার ঠোঁটে হাসি।

হাসি হাসি মুখ, ব্যাপার কি আয়নাবিবি?

হাসতে হাসতে আয়না বলল, সুখের খবর হলে সবাই হাসে, আমিও হাসছি। লতুর একটা ছেলে হয়েছে গো। তবে মেয়ে হলেই ভাল হত।

তোমার যেমন কথা।

তা বটে কথা মিষ্টি হলেই হিতকারী হয় না। ভাল কথা একটু তেতো তেতো লাগে।

নিতাই কোথায় ?

তাকে পাঠিয়েছি একটু চা জলপানের ব্যবস্থা করতে।

চল আমরা ছেলে দেখে আসি।

এখন আর দেখতে দেবে না গো। সেই বিকালবেলায়। লতুর বাতাস লেগেছিল। ডাক্তারবাবু তো ভয়-ই পেয়ে গিয়েছিল। খোদার ফজলে জান ও মাস দুটোই বেঁচেছে।

রমেশ হাসপাতালের সিঁড়িতে চুপ করে বসে পড়ল।

কি ভাবছ ?

লতিকা আর দলে থাকবে না। জমাটি দলে এইভাবেই ধীরে ধীরে ঘুণ ধরবে। এই তো নিতাই এসে গেছে। শোন নিতাই, কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি। দিন দুই তিন হাসপাতালের বারান্দায় থাকবি। কেমন! তারপর লতুকে ছেড়ে দিলে তাকে নিয়ে সোজা যাবি নবদ্বীপের বাসায়। আমাদের বায়না শেষ করে নবদ্বীপ যাব। তার আগে কোথাও যাসনি। যদি ভাল না হয়ে মন্দ কিছু হয় তা হলে পলাশথলিতে খবর দিস।

রমেশ এক গোছা টাকা তুলে দিল নিতাইয়ের হাতে। দিতে দিতে বলল, সাবধানে থাকিস। যা আমাদের জন্য কয়েক চাপ চা নিয়ে আয়। কাছেই দোকান আছে কি ?

আছে।

বেশ, তাড়াতাড়ি যা।

রমেশ কথা বলছিল আর আয়না বারান্দার দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে সব শুনছিল। নিতাই চলে যেতেই পাথরের মত শক্ত হয়ে বসল।

কি গো আয়নাবিবি ঘুমিয়ে গেছ নাকি ?

আয়নার ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখ না খুলেই বলল, তোমার নজর ভাল।

একথা কেন বলছ বিবিজান ?

আয়না চোখ পাকিয়ে বলল, তোমাকে আগেই বলেছি বিবিজান

মরে গেছে। বেঁচে আছে আয়না। তোমার পালাগানের রাধা বেঁচে আছে আয়নার দেহে আর মনে। বিবিজান বলে অপমান কর না। অভিনয়ের রাধা কি রাধা? রাধার মত মনটা তৈরি না করলে তোমার কেষ্টযাত্রা পটল তুলত গো রাধিকেমশাই।

থমকে গেল রমেশ।

আয়না বলল, তোমার বড় ভয়। লতিকা আর পালাকীর্তনে আসবে না, দলে ভাঙ্গন ধরবে। তুমি তো বললে না, লতিকা ঘর পেয়েছে, এবার সংসার পেল। তাকে মা বলে ডাকার মানুষ এল তার কোলে। কোথায় তুমি আনন্দ করবে, তা নয়। দল। দল দল করে সারা জীবন নষ্ট করতে চাও।

আহা রাগ কর না আয়না। আমাদের পলাশথলি যেতে হবে। এখানে আর দেরি করব না। নিতাই এলেই দুজনে রওনা হব।

আয়না গম্ভীরভাবে বলল, আমি যাব না।

ঠাট্টা রাখ। এখান থেকে বাস পাওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছতে পারব।

দৃঢ়ভাবে বলল বাস! কত বাস এল গেল কিন্তু আয়নাবিবি আর যাবে না। তুমি ফিরে যাও রমেশ। আমি যাব না, যাব না তোমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে রমেশ জিজ্ঞাসা করল, কেন?

সে তুমি বুঝবে না। তুমি তো মানুষ নও পাথর। পাথর দিয়েও ঠাকুর গড়া যায়। তোমাকে দিয়ে তাও করা যায় না। তোমার মত নিরেট পাথরের সেবা আর করব না। এবার মানুষ খুঁজে বেড়াব। যদি কোনদিন কোন মানুষের সন্ধান পাই তারই আশ্রয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেব। শেষ জীবনটা তার সঙ্গেই কাটিয়ে দেব।

রমেশের কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এতকাল আয়নার কথাগুলো ছিল হাল্‌কা ধরনের। আজ মনে হল কথাগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলছে। অনেক সময় আয়না অনেক কথা বলেছে, কিন্তু কখনও সে বলেনি দল ছেড়ে চলে যাবে। তার বক্তব্যের মধ্যে ছিল

দৃঢ়তার সঙ্গে ক্ষোভের সুর। তবুও বলল, মান অভিমানের সময় এখন নয়। প্রস্তুত হও। আজ আমাদের পলাশথলি যেতেই হবে।

আমার কথা তো বলেইছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

কি বলছ আয়না ?

ঠিক বলেছি রাধিকেমশাই। আমি আর যাব না। সময় পেলে নবদ্বীপে গিয়ে আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসব। না যেতে পারলে তোমরা বিলিয়ে দিও। ওতে আমার মায়া নেই। তুমি যাও রমেশ, তুমি যাও।

রমেশ অবাক হয়ে আয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

যাও রমেশ, তুমি চলে যাও। তোমার পালাগানের পার্টি নিয়ে আনন্দে দিন কাটাও। আমি যাব না, যাব না। তুমি আয়নাবিবিকে দেখেছ, তার অভিনয় দেখেছ কিন্তু কোনদিন ভাবনি আমিও লতিকার মত একটা মেয়ে। তুমি পাষাণ। তোমার হৃদয় নামক বস্তুটি শুকিয়ে গেছে।

উত্তেজিত হচ্ছ কেন আয়না ?

তুমি তোমার পথে যাও। আমাকে আমার পথে যেতে দাও।

আমি বুঝি তোমার দুঃখ কোথায়। তুমি লতিকার মতই মেয়ে, তাও জানি, বুঝি। তুমিও লতিকার মত পূর্ণ হতে চাও। নতুন একটা মানব শিশুর আধো আধো 'মা' ডাক শুনতে চাও কিন্তু।

আয়না ক্ষিপ্তের মত বলল, তোমার এই কিন্তুই আমার জীবনের অভিশাপ। ঘর ছেড়ে তোমার কাছে এসেছিলাম কেন! তোমার রূপ, তোমার বাঁশী আমাকে ঘরছাড়া করেছিল। সেদিন প্রয়োজন ছিল। সেদিন সামনে খোলা ছিল দোজখের পথ। আত্মরক্ষার তাগিদেই এসেছিলাম তোমার আশ্রয়ে। বছরের পর বছর দেখলাম। তুমি চাও তোমার দলের যশ, বিস্তার, প্রচার, আমার দিকে তাকাবার অবসর পাওনি। দল আর দল, পালা আর পালা; তুমি পাথর। তুমি হৃদয়হীন। তুমি স্বার্থপর। তুমি নিজের গৌরব চাও। তুমি

কাউকে ভালবাসনি, অন্যের গৌরবে নিজে গর্বিত হতে চাওনি। তুমি যাও, তুমি যাও। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

অসহায়ের মত রমেশ বলল, আমি নিরুপায়।

তা বটে। আমি পলাশথলি গেলে তোমার দলের জয়জয়াকার হবে। তাই আমাকে তোমার প্রয়োজন। কিন্তু কি পাব? অভিনেত্রীর সম্মান, গায়িকার প্রশংসা, নাচুনির তারিফ্। ব্যস্।—আয়নার চোখে জল।

রমেশের মুখে কথা সরছে না। বোবার মত আয়নার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আয়না ফোঁপাতে ফোঁপাতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ধরা ধরা গলায় বলল, আমি আর রাধা সাজব না রমেশ। অভিনয়ের রাধা আর সাজব না। অন্তরে রাধার মধুর শাশ্বত ভালবাসাটুকু সম্বল করে পথে বেরিয়ে পড়ব। আমি তোমার রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা নই রমেশ। আমি তাজা রক্ত মাংসের কেষ্ট খুঁজব। আমার অন্তরের রাধা তার সেই নবনীত কমলকান্তি সুন্দর সুঠাম প্রেমময় মানুষ কৃষ্ণের সন্ধানে বের হবে। আর অভিনয় করব না। মানুষ কেষ্টকে ভালবাসলে, নারী জীবনের পূর্ণতা এনে দেবে। তাই বিরহিনীর মত পথে পথে ছুটে বেড়াব। আমার সাধের কৃষ্ণ আজও পেলাম না। পাইনি, হয়ত পাবও না। বৃথাই আমার রাধা সাজা, বৃথাই অভিনয়। বৃথা তোমারও অভিনয়। আসল মানুষের চেহারা তুমি অভিনয়ের পাদপীঠে হত্যা করেছ।

রমেশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ভুল ভুল হয়েছে আমার। ক্ষমা কর আয়না। তোমাকে না নিয়ে আমি এক পা-ও নড়ব। তোমার অভিযোগ সত্য, পুরানো মন আর দম্ভ আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। আর ভুল হবে না। চল, আমরা পাশাপাশি চলব, আমরা অভিনয়কে বাস্তব রূপ দেব।

*ঠিক?*

হাঁ, ঠিক। যবনী-রজকের প্রেম যাতে অক্ষয় হয় তার জন্য যা

বলবে তা আমি করব। মানুষের প্রেম? আমরা মানব-মানবীর প্রেমকে অক্ষয় করে তুলব। জাত-ধর্ম আমাদের নেই। আমরা পরিচয় দেব একজন নারী ও একজন নর, যারা পার্থিব অসামাজিক সংস্কারের অনেক উর্ধে। চল।

আয়না অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, এ প্রেম যবনী-রজকের প্রেম নয়, এ প্রেম চিরসুন্দর শাশ্বত মানব-মানবীর প্রেম।

নিতাই আসছে। তাকে যা বলার বলেছি। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চল পলাশথলিতে।

পলাশথলির পালা শেষ করে সবাই ফিরে এল নবদ্বীপের বাসায়।

আয়না সেদিন কনে বউয়ের সাজে সেজেছে।

ঝুঁচি জিজ্ঞেস করল, আয়নাদির কি বিয়ে!

চুপ। তোরা শাঁখ নিয়ে প্রস্তুত থাকিস, কেমন।

সন্ধ্যাবেলায় রমেশের গলায় মালা দিয়ে আয়না প্রণাম করল, রমেশ তার গলায় পরিয়ে দিল কণ্ঠীমালা।

পাঁচু-ঝুঁচি-লতিকা সবাই মিলে শাঁখে ফু দিল। হেপাতুল্লা ও মন্টির দল তখন অভ্যাগতদের বিয়ের ভোজে বসিয়ে দিয়েছে।

রমেশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, খুশি?

তুমি? মুখ নীচু করে সদ্য পরিণীতা বধূর মত মিষ্টি হাসল আয়না।

রমেশ আয়নার দুটো হাত কোলের উপর তুলে নিয়ে বলল, আমিও!

## দুই

আড়াআড়ি করে বাঁধা বাঁশের দুপাশে কয়েকটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ঝুলছে। অন্ধকার নামতে না নামতেই লণ্ঠনগুলোর চিমনি পরিষ্কার করে তাতে কতটা কেরাসিন আছে দেখে নিল নৈমুদ্দি। একটা একটা করে লণ্ঠনগুলো জ্বেলে দিল। লখা ওরফে লখীন্দর বাঁশের মাথায় দুটো করে তেলের মশাল জ্বেলে দিতেই চরের শুকনো বালি চক্ চক্ করে উঠল। বালির গা থেকে আলোর রোশনাই যেন ছিটকে পড়তে থাকে।

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ ভাঙ্গা মেঘের তলা থেকে তখনও উঁকি-ঝুঁকি দেয়নি, তখনও আঁধারে মুখ ঢেকে মাথা উঁচু করার চেষ্টায় রয়েছে। রাত চরা পাখিরা ওপারে গেছে শয়ের করতে অথবা আশ্রয় খুঁজতে। শোঁ শোঁ করে চরের বুকে মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কা লাগছে, মশালের আলো দপ্‌দপিয়ে হেলছে দুলছে।

নৈমুদ্দি আর লখা বালির চরে ধানের পোয়াল বিছিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি ধরিয়ে সবে মাত্র বিশ্রামের সুযোগ খুঁজছে এমন সময় দু-একজন করে গাঁয়ের মানুষ আসতে থাকে। আজ আলকাপের আসর বসবে। আসর বসবে মাঝের পাড়ার মাঠে। আশপাশের দু-চারজন এলেও তখনও গাজিপাড়া আর বাছুরডোবার সব মানুষ এসে পৌঁছায়নি। ঘরের কাজ শেষ করে, রাতের খাবার খেয়ে দূরের মানুষ আসে। ধীরে ধীরে মেয়ে-মরদ বাচ্চা-কাচ্চা দল বেঁধে সবে আসতে আরম্ভ করেছে। শ্রোতারা শুকনো বালির ওপর বিছানো পোয়ালে বসতে আরম্ভ করেছে। মেয়েরা বসেছে পুরুষদের উল্টো দিকে, তাদের যোগসূত্র রক্ষা করছে কাচ্চা-বাচ্চারা। আকাশের অবস্থা আজ বিশেষ ভাল নয়, বেশ থম থমে ভাব। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা মেঘের তলা দিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে, মেঘ জমাট বাঁধলেই আসরের দফা

রফা হয়ে যাবে। হঠাৎ পদ্মার বুক বেয়ে পাগলা ঝড়ো হাওয়ার দমকা ধাক্কা জানিয়ে দিয়ে গেল, সাবধান! লক্ষণ ভাল নয়।

প্রকৃতির পাগলামীর সঙ্গে চরের মানুষ পরিচিত। তারা ভীত হয় না, সতর্ক হয়। আকাশের অবস্থা দেখেই তারা সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি করে। এটাই চিরকাল হয়ে আসছে। বছরের শেষে চরের মানুষ একটা কিছু করার ও দেখার স্বপ্ন দেখে। একঘেয়ে জীবনের মাঝে কিছু নতুনত্ব তারা চায়। তাদের করার ও দেখার জন্যই গাঁয়ের সবাই মিলেমিশে আলকাপের আসর বসায়। পদ্মার চরের মানুষ এপারে তাকায়, ওপারে তাকায়। দুটো আলাদা জেলায় তাদের গতিবিধি, জেলা শহর থেকে অনেকটা দূরে থেকেও শহরের উষ্ণতা চায় তাদের নীরস জীবনে।

প্রতিবারই বছর শেষে আলকাপের আসর বসে। এবারও বসবে। মহরা চলছে ধানকাটার পর থেকেই। ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের প্রথমে কলাইয়ের ঝাড় ঘরে এলে আর বিশেষ কাজ থাকে না। তাই বছরের শেষ দিকেই আলকাপ জমে ভাল। আলাপটাই হল আলকাপের মূল কথা। আলাপ জমাবার জমানা শেষ হয়ে গেছে। আলকাপিয়ারা আজকাল আল্লার নামও করে না, অথচ আল্লার রহম পেতেই আলকাপের জন্ম। তবে, কবে কোথায় প্রথম আলকাপের সূচনা তা বলতে পারে না কেউ। তবুও আলকাপিয়ারা ক্ষান্ত হয় না, ওসব ইতিহাস জানা ওদের কুষ্ঠিতে নেই। দরকারও হয় না।

চৈত্র মাসেই আলকাপ জমে ভাল। শীত তখন আর থাকে না, থাকে মিঠে বাতাস। পদ্মার বুক বেয়ে যে বাতাস ভেসে আসে তাতে থাকে বসন্তের দোলা। এই দোলাতে দুলতে থাকে চরের জোয়ান ছেলেমেয়েরা। চৈত্রের আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার থাকে, চাষীর কাজ কম, পদ্মার বুকে নতুন নতুন চর জাগে, চরের ভেজা বেলে মাটিতে খেসারী-কলাই ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত থাকে চাষীরা। চরের বুকে রুপালি বালিতে জ্যোৎস্নার খেলা হাতছানি দেয় চরের মানুষদের। ওরা চাটাই পেতে শুয়ে শুয়ে রাত কাটায়। সন্ধ্যার সময় নিঝুম হয়

পরিবেশ, অনেক দূরে নদীর ওপারে শহর। শহরের বিজলী বাতির মিটমিটে আলো জোনাকির মত জ্বলতে থাকে। আর চরের গেরস্তরা সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে তেলের কুপি নিভিয়ে বাড়ির সামনে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করতে করতে চরের বুকেই চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। চরের এই জীবনে সামান্য আলোড়ন আর পরিবর্তন আনে আলকাপ গান। সুরে-বেসুরে গাইলেই যদি গান হয় তা হলে আলকাপের গানও গান; মনোরঞ্জন করতে যদি গান গাওয়া হয়, তা হলে আলকাপের গানও মনোরঞ্জনকারী শ্রেষ্ঠতম গান। এ গানের মহিমা-অপার, এতে না থাকে গাঁথুনি না থাকে বাঁধন, না থাকে চলতি কোন সুর, কিন্তু এতে থাকে সাধাবণ মানুষদের নানা সমস্যা নানা সমালোচনা, নানা ব্যঙ্গ, নানা সুর। তা গাওয়া হয়, শুনতে আসে গ্রামের আবালবৃদ্ধ বণিতা।

চরে ছোট ছোট গ্রাম।

এই গ্রামও স্থায়ী গ্রাম নয়। বর্ষার জলে, বন্যার তোড়ে চর ভেসে গেলে নতুন চরেব সন্ধান করে এইসব গ্রামের মানুষ, নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে। কোন গ্রামে থাকে দশ ঘর, কোন গ্রামে বিশ ঘর কোথাও সামান্য কিছু বেশি। নিজেরাই গ্রামের নাম রাখে. সেটেল-মেণ্টের রেকর্ডে লেখা থাকে পয়স্তি জমি। সবটাই লাখেবাজ, সভ্য শাসনের চিহ্ন সহসা দেখা যায় না।

আজ হোগলাবাড়ির চরের মাঝের গ্রামে আলকাপের আসর।

হোগলাবাড়ির চরে প্লাবনে ডোবেনি আগের বছর। তাই গ্রামের সংখ্যা বেশি। অন্য সব চর ছোট ছোট, কোন চরে নতুন একটা গ্রাম নিয়েই উপনিবেশ।

আলকাপের আসর বসলে বহু দূরদূরান্ত থেকে চরের মানুষ আসে নৌকায়, চরের বাসিন্দাদের প্রাণে জোয়ার উঠে আলকাপী নাচ-গানে। বছরের পর বছর সব কটা মাস কাটে ভয়ে ভয়ে। কখনও ঝড় তুফানের ভয়, কখনও কখনও বানের ভয়। পদ্মার ঢল নামলে নদী রুদ্রমূর্তি ধরে। পদ্মার জল বাড়তে থাকলে সদাই ভয় প্লাবনের।

কোন কোন বর্ষায় চরের অনেক গ্রাম ধুয়ে মুছে যায়। অন্য সময় যে সব চর জলঘেরা দ্বীপের মত মনে হত সেগুলোর চিহ্নও থাকত না বর্ষার পর। বর্ষার টিপ্‌টিপানি বৃষ্টি আরম্ভ হলেই পালা করে চর পাহারা দেয় গ্রামের জোয়ান ছেলেরা, মেয়েরা সংসারের হাড়ি কলসী বদনা সামলায়, বয়স্ক মুরুব্বিরা নৌকা ঠিক রাখে, গেরস্থালী সামগ্রীর সঙ্গে থাকে গরু হাঁস ছাগল মুর্গী। নদীর জল বাড়তে থাকলেই নৌকায় আশ্রয় নিয়ে কেউ যায় মুর্শিদাবাদের ডাঙ্গায়, কেউ যায় রাজসাহীর ডাঙ্গায়। অনেকে তাদের চালাঘরের বাঁশ, খড়ের চাল অবধি নৌকায় তুলে নেয়। আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় জলের রং দেখে আর স্রোতের বেগ দেখে। পদ্মার জল তখন ঘোলা। গঙ্গার উপরদিকে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হলে বিহার, উত্তরপ্রদেশের লালমাটি ধুয়ে আসে, গঙ্গার জল হয় ঘোলা, ফতুল্লাপুরে ভাগীরথীতে এসে গঙ্গা দুভাগ হলেও গঙ্গার নিচের অংশের জল হয় আরও ঘোলা, ছুটে চলে পদ্মা শিরোনাম বুকে করে। সবাই চিন্তিত কিন্তু ভীত নয়। চিন্তা করে এই ভেসে গেল চর, প্রস্তুতি থাকে আত্মরক্ষার। মুরুব্বিরা কাঁচা তামাক কল্কে ভর্তি করে খেলো হুঁকায় চাপিয়ে ছোটদের কোন কোন সালে বান এসেছিল, তখন তারা কিভাবে আত্মরক্ষা করেছিল, এই সব গল্প কথা শোনায়, তারা উৎসাহিত হয়, অনাগত বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। জোয়ান ছেলেকে ডেকে মুরুব্বিরা বলে, পাহাড়ে ঢল নেমেছে, পানির দিকে নজর রাখিস।

সব বছরে তো বান আসে না। দু-চার বছর ভালই কাটে। যে বছর বান আসে সে বছর যে যার সন্তান-সন্ততি গৃহপালিত জন্তু নিয়ে প্রস্তুত থাকে, বানের প্রকোপ দেখলেই নৌকায় চেপে বসে। নদী ছেড়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দেয় নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। নদীর বাঁধ অথবা পাকা রাস্তার ধারে, ঝুপড়ি বাঁধে। গেরস্থালী সব কিছুর সঙ্গে থাকে গরু-ছাগল-মুরগী। নতুন করে সংসার পাতে নদীর বাঁধে পাকা রাস্তার কিনারায়, বানের জল নামলেই চরের বাসিন্দারা খোঁজে তাদের ফেলে আসা গ্রামের চর, কখনও তা খুঁজে

পায়, কখনও পুরানো চর জলের তলায় হারিয়ে গেলে নতুন চরের আশায় নৌকা নিয়ে ছোটাছুটি করে। নতুন চর জাগলে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠবার সময় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, নানা হুজ্জুত হাঙ্গামাও আরম্ভ হয়। বাঁশ চাই, দর্মা চাই, খড় চাই, নতুন করে ঘরে বাঁধতে সীমানা সহরদ্দ করা হয়। মেয়ে-মরদ, কাচ্চা-বাচ্চা নেমে পড়ে পয়স্তি পাশের চরকে উর্বর করতে। বেওয়ারিশ চরের জমির ভাগ বাঁটোয়ারা করতে কাজিয়া হয়, কখনও কখনও মারপিট দাঙ্গাও হয়। নতুন উপনিবেশের পুরানো মানুষগুলো তখন পঞ্চায়েত বসায়, আলোচনা করে জমি ভাগ করে। চর এলাকায় ইংরেজ সরকারের আইন অচল, গ্রাম শাসন করে নিজেদের তৈরি পঞ্চায়েত, যদি কখনও খুনখারাপি হয়, কেউ যদি থানায় গিয়ে হাজির হয়, তখন পুলিস আসে, তাও তিন-চারদিন পর। তখন লাশ হাপিস্ হয়ে যায়; কখনও চরের বালির তলায়, কখনও মুখে আগুন ছুঁইয়ে পদ্মার প্রচণ্ড স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। লাশের সৎকার ঘটে জলজ প্রাণীর মুখে। হোগলবাড়িয়ার চরের লাশ ততক্ষণ পৌঁছে যায় মেঘনার খাঁড়িতে। গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বিরা সালিশ বসায়, মীমাংসা করে, জরিমানা করে, জমির চৌহাদ্দি ঠিক হয়। মালিকানা স্থির হয় পরিবারের জনসংখ্যা অনুপাতে। ফিরে আসে শান্তি। যদি কারও প্রিয়জন হারিয়ে যায় তাও ভুলে যায় দিনের পর দিন পেরোলে। শুরু হয় একঘেয়ে জীবন।

চরের বাসিন্দাদের অধিকাংশই চাষী, অনেকাংশ জেলে। সবাই নৌকা বাইতে পটু। এদের জীবনধারা মনে করিয়ে দেয় আদিমযুগের খানাবদলের গোষ্ঠীকে। সেকালেও মানুষ আহার্য আর আশ্রয়ের প্রত্যাশায় ছুটে বেড়িয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে। একালের চরের মানুষ সেই ঐতিহ্য কিছুটা রক্ষা করে চলেছে। চাষীদের বৃহদাংশই মুসলমান। সবাই জানে ওরা নামেই মুসলমান, কামে নয়, ওদের পরিচয় চরের মানুষ। বেনমাজী, রোজার মাসও অনেকে মানে না, তবে বিধি বদলের কানুনটা সবারই জানা। চাষীদের কিছুটা অংশ চাঁই। আনাজ তরকারীর চাষী। ধান কলাই মুসুর এরা

আবাদ করে না। উৎপন্ন ফসল নিয়ে নদীর ওপারে কোন হাটে গঞ্জে যায়। নগদ কড়ি কামাই করে। পেটের ভাত রোজগার করে পয়সার বিনিময়ে। জেলেদের প্রায় সবাই হিন্দু। তারাও নামে হিন্দু, কাজেকর্মে হিন্দুর দু-একটা পরব কখনও কখনও পালন করে। মসজিদ নেই, মন্দির নেই, পাশাপাশি চালে চাল বেঁধে বাস করে হিন্দু ও মুসলমান। ওদের একটাই ধর্ম, সে ধর্ম হল বাঁচার ধর্ম। বাঁচতে রসদ দরকার, সেটাই তারা সংগ্রহ করে কঠিন মেহনত করে। জেলেদের লখা আর চাষীদের হাসিম কয়েক বছর শহরের পাঠশালায় পড়েছে। তারাই হোগলবাড়িয়া চরের তিনটে গ্রামের একমাত্র এলেমদার। লখা থাকে ভাটিতে বাছুরডোবায়, উজানে গাজিপাড়ায় থাকে হাসিম। এই দুই গ্রামের মাঝে হল মাঝেরগ্রাম উত্তর আর দক্ষিণের দুটো গ্রামকে আলাদা করে রেখেছে মাঝেরগ্রাম। একটা গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রামের দূরত্ব আধ মাইলও নয়।

সেবার মাদারের নাচে সেরা নাচিয়ে ছিল বাছুরডোবার আলিমুদ্দি। লম্বা বাঁশের মাথায় কালো চামর আর লাল-নীল কাগজের পতাকা বেঁধে ঢাকের তালে তালে বাঁশটাকে বুকের সঙ্গে সোজা করে জাপটে নিয়ে নেচেছিল আলিমুদ্দি, তিনটে গ্রাম ঘুরেছিল একাই, জেলেদের মাখন হল ঢাকি আর কাঁসি বাজিয়েছিল মুরু। প্রতি বছর ঘোরতর বর্ষার চেহারা যখন ভয়ঙ্কর হয় তখনই বরুণ দেবতাকে তুষ্ট করতে মাদারের বাঁশ নাচায় গ্রামের জোয়ান ছেলেরা। যেবার বানের জলে তোড় কম থাকে, চরের ফসল ডোবে না, সেবার সবাই জানতে চায়, এবার কে মাদার নেচেছিল।

এবার নেচেছিল চাঁইদের শম্ভু।

সবাই বলে শম্ভুর পয় ভাল। আসছে বছর শম্ভুই নাচবে। কোন বছর যদি বানের জলে ভেসে যায় চর তখন প্রথমে ঘর সামলায় চরের বাসিন্দারা তারপর ঠিক করে সে বছর শম্ভু মাদার নাচ করা সত্ত্বেও বান হল কেন, তারপরই নাচের মানুষ বদল করে। যে বার থেকে আলিমুদ্দি মাদারের বাঁশ ঘাড়ে নিয়েছে

সেবার থেকে আর বানে চর ভাসেনি, অপর্যাপ্ত ফসলও হয়েছে হোগলবাড়িয়ার চরে।

পৌষ সংক্রান্তির সকালবেলায় মাখন বাজায় ঢাক, নুরু বাজায় কাঁসি, হাসিমের হাত ধরে এগিয়ে যায় শম্ভুর মেসো আর মাসী, ঢাক কাঁসির আওয়াজে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা দলে দলে। আজ মকর জাগবে, কাল তার পূজা। জেলেপাড়ার বড় উৎসব মকর পূজা, পৌষ সংক্রান্তির স্নান, নৌকা পূজা। মাখনের ডোবায় মাথা ডুবিয়ে বছর কাটায় কাঠের মকর, ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে সঙ্গে কাঠের দেবতা মাথা তোলে। সবাই বলে ঢাকের আওয়াজের এমন মাহাত্ম্যিতে ঘুম ভেঙে যায় দেবতার, নিজে নিজেই মাথা তোলে, ভেসে ওঠে। সবাই বলে, অথচ কেউ দেখেনি। হোগলবাড়িয়ার চরে ডোবার জলে নেমে পড়ে, আলিম, হাসিম, শম্ভুর মেসো, জাফর মিঞার দল। সারা বছরে একদিন, বাকি কদিন জলের তলায় থাকতে থাকতে কাঠের দেবতার ওজন ও গতর বৃদ্ধি পায়, ডাঙ্গায় টেনে তুলতে অনেক জোয়ান দল বেঁধে নেমেও হাঁপসে পড়ে।

মকর সংক্রান্তি বড় ধূম। চরের মেয়ে মরদ প্রসাদ পায়। কোন কোন বছর একটার বদলে দু-তিনটে পাঁঠা বলি হয়। মাঝরাতে ভোজ খেয়ে যে যার মত ঘরে ফিরে যায়, শেষরাতে কেউ কেউ সমবেত হয় ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে মকরকে সলিল শয়ান করতে। বছরের পর বছর এমনি ধারা জীবন নিয়ে অভ্যস্ত সবাই।

পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন রোদ পুইয়ে আর কাঁথা কম্বল জড়িয়ে কেটে যায় ওদের। কোন অভিযোগ নেই, ঘরের মেয়েরা বর্ষা পার হলেই ছেঁড়া কাপড় লুঙ্গি নিয়ে বসে কাঁথা সেলাই করতে। কাপড়ের পাড়ের সুতোয় লম্বা লম্বা ফোঁড় দিয়ে কাঁথা তৈরি হয় আগামী শীতকে জব্দ করতে। পড়শীরা কার্তিক মাসে রোদে পিঠ দিয়ে কাঁথা সেলাই করে, অগ্রাণে ধানের আমদানী হলেই ঢেঁকির শব্দে গ্রামগুলো নতুন ছন্দে প্রাণের পরশ খুঁজে পায়। বর্ষায় মাদার নাচ। ছেলেদের পায়ে থাকে ঘুঙুর, মাদারের বাঁশের নাচের সাথে ঘুঙুর বাজে, ঢাক বাজে, কাঁসি বাজে,

আকাশে বিজলীর চমক আর মেঘের গুরু গুরু শব্দ সব মিলিয়ে যে জীবনের ইঙ্গিত ও আশঙ্কা দেখা দেয় তা নিমেষেই লোপ পায় কার্তিক অঘ্রাণে নতুন জীবনের আশা জাগে ঢেঁকির শব্দে। তারপরই মকর।

মকর হাসিম শেখে ঠাট্টা করে বলে, তোদের ঢেঁকি দেবতা পানীতে শয়ান হল। এবার জাল নিয়ে নেমে পড় গাঙ্গে।

জেলেপাড়ায় মানুষ জাল বুনেছে, গাব দিয়েছে জালে, লোহার গোলগোল টুকরো বেঁধেছে ইলিশের মরশুমের অপেক্ষায়। বর্ষায় ইলিশ উজানে আসে, জেলেরা ছোট ছোট নৌকা নিয়ে জাল বিছিয়ে দেয় মাঝ গাঙ্গে। ইলিশ না উজালে গালে হাত দিয়ে ভেবেছে। এবার নগদ কড়ির অভাব হবে সে আশঙ্কাও আছে।

শীত শেষ, দখিণা বাতাসের কাঁপুনী কমেছে, চরের জমিতে কলাই, মুসুরী আর ছোলার দানা পাকতে আরম্ভ করেছে। যে যার নিজের জমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এই সময়টা। তারপর?

কাজ নেই কম্ম নেই।

আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ। কখনও কালোয় ছেয়ে যায় আকাশ। ছুটে আসে উত্তর-পশ্চিম থেকে ভয়ঙ্কর বাতাস। বালির ঝড় ওঠে, কখনও প্রবল বর্ষণও হয়। দু-একবার শিল পড়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিল কুড়িয়ে খেলা করে। আকাশ পরিষ্কার হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। তারপর প্রচণ্ড রোদের তাপে চরের বালি গরম হয়ে ওঠে। দুপুরে বালির চরে পা দেওয়া যায় না। বিকেলবেলায় মিঠে বাতাস। বেসুরে মিঠে গান গেয়ে বেড়ায় জোয়ান ছেলেরা, নদীর কিনারায় গিয়ে বসে, বদ্ধ জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরার আশায়।

এবার আলকাপের আসর বসে।

প্রতি বছরই এই আসর বসে মাঝেরগ্রামে।

তিনটে গ্রামের মানুষ হাজির হয়। অন্য চরের মানুষও আসে নৌকা করে। আলকাপের গান শেষ হলে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

জলঘেরা চর। চর পেরিয়ে উত্তর গাং শেষ হয়েছে রাজসাহীতে, দক্ষিণ গাং শেষ হয়েছে মুর্শিদাবাদে। উত্তরে মূল ভূখণ্ডে শহর, কিনারা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। চরের মানুষ সকাল হলেই ছুটোছুটি করে, পসরা নিয়ে শহরে যেতে। চাষীরা-চাঁইরা যায় শহরে, যাদের নৌকা নেই তারা জেলেদের নৌকায় সোয়ারী হয় শহরে কেনাবেচা করতে। আমুশেখের মুদিখানা গ্রামের ছোটখাট প্রয়োজন মেটায়। নুন, সরষের তেল, কেরাসিন পাওয়া যায়, পাওয়া যায় তামাক আর চিটে গুড়। এর বেশি প্রয়োজন হলে যেতে হয় এপারে শহরে কাতলামারির হাটে। আমুর দোকানে দু রকমের কেরাসিন পাওয়া যায়, চরের মানুষ বলে সাদা কেরাচ আর লাল কেরাচ। সাদার দাম বেশি তাই লাল কেরাচের চাহিদা বেশি. রাতের বেলায় খাওয়া দাওয়া মেটাতে কুপি জ্বালায় লাল কেরাচে, পালা-পার্বনে লণ্ঠন জ্বালাতে হয় তবেই দরকার হয় সাদা কেরাচের। কুপির লাল কেরাচের ধুয়োঁতে অনেক সময়ই গেরস্ত বাড়িতে দম বন্ধ হবার মত হলেও কেউ তা গ্রাহ্য করে না। সভ্য জগত থেকে খুব বেশি দূরে ওরা বাস করে না ঠিকই কিন্তু সভ্য জগতের আইন-কানুন চরের জমিতে অচল। তবুও চরের মানুষ অসভ্য নয়। সারাদিন কাজ করে, কাজের শেষে চাঁদের আলোতে চরের বালিতে চাটাই বিছিয়ে বসে, সুখ-দুঃখের গল্প করে। শহর ফেরত অনেক খবর নিয়ে আসে। সে সব গল্প শোনায়। গরীবের ঘরে কুপি জ্বলে সন্ধ্যা-বেলায়, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে, কুপি নেভায়, মেয়েরা গা এলিয়ে দেয় চাটাইতে, পুরুষরা তখন গল্পের মজলিসে বসে। ওদের চাহিদা কম, পরিতৃপ্তি অল্পতে। এই পরিতৃপ্তি তাদের সহজলভ্য। গ্রীষ্মকালে যেমন খোলা আকাশের তলায় রাত কাটায়, বর্ষায় তেমন ঘর সামলায়, শীতে পোয়ালে আগুন দিয়ে সবাই গোল হয়ে বসে, দেহ তপ্ত করে, রাত বাড়লে যে যার মত বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কাঁথা কম্বলের তলায় ঢোকে। পরস্পরের দেহের তাপে উত্তাপ সৃষ্টি করে বেঘোরে ঘুমোয়। আমেজটা বেশ ভাল করে উপভোগ করে। এই জীবন পদ্ধতির বিশেষ কোন ছেদ নেই, বেশ সহজ সরল নির্বিঘ্ন এই জীবন।

এই একঘেয়ে জীবনকে আনন্দময় করে আলকাপের নাচ ও গান। শীতের পর বসন্তের বাতাসে ঝোপঝাড়ের পাতা যখন খসে পড়ে, নতুন পাতা গজাতে থাকে, চাষের কাজ থাকে না, জেলেদের কাজেও ঢিলা পড়ে, তখন চরের মানুষের মন উড়ু উড়ু করে, তারা চায় কিছু নতুনত্ব, কিছু আনন্দ, কিছু মানসিক পরিতৃপ্তি। জেলেরা উজানী ইলিশের আশা ছেড়ে দিয়ে রাতের আঁধারে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে বেড়জাল নিয়ে নৌকা ভাসায় মাছের ধান্ধায়, তখন পদ্মার জলেও টান কম, হাল চেপে ধরে মিঠে বাতাসে গান গায়, খেলো হুঁকোর কাঁচা তামাকের ধুঁয়ো টানে। প্রকৃতি সবাইকে হাতছানি দিয়ে যেন ডেকে বলে, আলকাপের সময় হয়েছে।

বাঁশ বাঁধে হাসিম, লখা তার বড় সাগরেদ।

কয়েক বছর যাবত কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে চরের জীবন-ধারার। কয়েক ঘর চাঁইমণ্ডল ঘর বেঁধেছে চরে। তাও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। বাছুরডোবার ঢালুতে নতুন যে চর জেগেছিল কয়েক বছর আগে তাতেই ঘর বেধেছিল ওরা। ধীরে ধীরে মিশে গেছে আগের বাসিন্দাদের সঙ্গে। সংখ্যায় সাত আট ঘর। জনসংখ্যা পঁচিশ তিরিশ। চাঁইরা বাঙ্গালী অথবা বিহারী তা বলা কঠিন। গঙ্গার উজান ভেঙ্গে ভাটিতে এসেছে রাজমহল অথবা সাহেবগঞ্জ থেকে। ওদের মুরুব্বিরাও বলতে পারে না কোথায় ছিল তাদের আদি বাস, তবে ছিল কোন নদীর চরায়। বাংলা আর খোট্টাই ভাষার জগাখিঁচুড়ি ওদের মাতৃভাষা। ওরা হিন্দু অথবা মুসলমান তাও সঠিক করে বলা কঠিন। ওদের জাত জানতে চাইলে বলে আমরা চাঁই মোড়ল। ওরা নমাজ পড়ে না, রোজার সময় নেহাৎ দরকার না হলে দিনের বেলায় খায় না, মন্দিরে যায় না, নানা লৌকিক দেবতার পূজা করে। পূজার বেদীর সামনে বলি দেয় পাঁঠা, পায়রা, হাঁস, মুরগী। মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দেয়। লাল চুড়ি পরে হাতে, শাঁখাও থাকে কারও কারও হাতে। বেহুলা ভাসানের গান করে মেয়েরা, ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে পুরুষরা। ধর্মে যতটা হিন্দু নয় তার বেশি কৃষ্টিতে হিন্দু। কখনও

বিয়ে সাদী করে না গোষ্ঠীর বাইরে। সুর করে মাণিকপীরের পাঁচালিও গান করে বিশেষ বিশেষ উৎসবে। তবে এদের খ্যাতি আনাজ চাষে। শাকসব্জী চাষে এদের তুলনা নেই। চরের অহল্যা জমিতে কোদাল চালিয়ে বীজ ছড়ায়, সবুজের সমারোহ ঘটায়। ছোট ছোট নৌকা করে তাদের চাষের আনাজ তরকারী নিয়ে যায় ওপারের শহরে। ওপারের গ্রাম গঞ্জে আর হাটে। এরা ধান গম রবিশস্য চাষে সহজে হাত দেয় না। জেলেদের সঙ্গে মাছও ধরে না। চাষের মাটিতে পলি পড়লে উৎকৃষ্ট শাক, পটল, টমাটো জন্মায়। চাঁই বাড়ির মেয়েরা ঝুড়ি বোঝাই দিয়ে সেই সব আনাজের ঝুড়ি নিয়ে যায় বাজারে, বাজারে চাঁই মেয়েদের ভিড় থাকলেও পুরুষদের কদাচিত দেখা যায় বাজারে। পুরুষরা মাঠে কাজ করে, অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা সংসার সামলায়। বয়স্ক মেয়েরা নগদ কড়ি আনে ঘরে। সংসারের অনেক খুঁটিনাটিও দেখে পুরুষরা। নীরস চরের জমিকে সরস করতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, ওদের ঘরে ধানের মড়াই থাকে না, থাকে নগদ কড়ি। চাঁই বাড়ির একটা ছেলে পান্তা খেয়ে সকালবেলায় মায়েদের সঙ্গে শহরে যায়, পাঠশালায় পড়ে আবার মায়ের সঙ্গে ফিরে আসে। যেমনই হোক না ওদের জীবন পদ্ধতি কিন্তু খুব সুশৃঙ্খল আর বিনম্র তারা গৃহ ধর্মে।

প্রতিবারই চাঁইপাড়ার ছেলে বুড়ো জমায়েত হয় আলকাপের আসরে।

হাসিম আলি লণ্ঠনগুলো জেলে দিয়েছে, বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে, আর মনে করছে জোয়ারী মেঘ গানের আসর ভেঙ্গে দেবে। গান আরম্ভ হতে তখনও দেরি। ক্রমে ক্রমে ভিড় জমছে। কেউ কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

আলকাপিয়ারা গ্রামের দরজায় দরজায় নাচ করে বেড়ায়। আসরে জমায়েত হয় কম। ঘর সামাল দিয়ে অনেকেই আসতে পারে না গান শুনতে। ছোট ছোট চরের দরজায় দরজায় কল্পনার ফানুস ফাটিয়ে বাস্তবকে চোখের সামনে তুলে ধরায় এই অভিনব সুযোগ সব সময়

আসে না। অনেকেই অপেক্ষা করে আলকাপিয়াদের নতুন করে আসর বসায়। সব সময় দরজায় দরজায় ঘুরতে চায় না আলকাপিয়ার দল। সখের দল, সখ হলেই দল বাঁধে, সখ মেটাতে কখনও দোরে দোরে ঘোরে, কখনও আসর বসায়। হোগলবাড়িয়া চরের মানুষ মাঝের গ্রামে আসব বসায় চিরটা কাল, আসর চলে নাগারে কয়েকদিন। গ্রামের মানুষ, তিন চরের মানুষ যেমন আসে তেমনি সঙ্গীত রসিক শহুরে বাবুরাও মাঝে মাঝে আসে আলকাপের গান শুনতে। তাদের নৌকা ঘাটে বাঁধে, অনুষ্ঠান শেষ হলে রাতের আঁধারেই শহরে ফিরে যায়।

আলকাপের গান বাঁধে হাসিম। প্রথম দিকে হারমোনিয়াম ছিল অচল, অনেকের কাছে অজ্ঞাত বাদ্যযন্ত্র। দোতারা আর ডুগি আর ঢোলক ছিল আলকাপের সেরা বাদ্যযন্ত্র, কখনও কখনও পিকলু বাঁশীও কেউ কেউ বাজাত। মাটির হাঁড়ি পেটের ওপর উল্টে নিয়ে হাড়ির গায়ে চাঁটি দিয়ে বোল তুলতে ওস্তাদ হাসান সরদার। হাসান হাঁড়ির বোল তুলতে শিখেছিল তার চাচা ফয়জুল্লার কাছে। গ্রাম্য বাদ্যের এই ঐতিহ্যকে আধুনিক করে তুলেছিল হাসিম আলি। পনের টাকায় এক রিডের হারমোনিয়াম কিনে চমক লাগিয়ে দিল। নুটু বোরেগী তার হারমোনিয়াম মাস্টার।

নুটু বোরেগী তাব বোষ্টুমি খাঁদুবালার সঙ্গে হারমোনিয়ম আর ডুগি বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করত। হাসিম আলি তার পেছন পেছন ঘুরে হারমোনিয়মের সা-রে-গা-মা রেওয়াজ করেছিল কিছু কাল। মাঝে মাঝে নগদ কিছু দিয়ে নুটুকে নিয়ে আসত চরে। সেখানেই তালিম নিত তার কাছে। মাঝে মাঝে বেসুরো হলেও হাসিম পিছিয়ে পড়েনি, এগিয়ে যেতেই চেষ্টা করেছে। লখা ঢোলক বাজায়, নৈমুদ্দি দোতারা হাতে নিয়ে নাচতে নাচতে আসরে ঢুকেই আল্লার নামে জিগীর ছাড়ে, "আল্লা আল্লা বল বান্দা, নবী কর সার, আল্লার নামেতে যাবি দুনিয়ার ওপার।" এরপর আরম্ভ আলকাপের মূল নাচ ও গান। নৈমুদ্দি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে

গান গায়, ছড়া কাটে দোহাররা জিগীর দেয়। নাচের কোন মাস্টার নেই, কেউ তাণ্ডব নাচে, কেউ খেমটা নাচে কেউ অন্য কিছু নিজের খেয়াল খুশি মত। কিছুটা উদার, কিছুটা অশালীন ভাবেই নাচিয়েরা আসর জমায়। নৈমুদ্দির সঙ্গে নামে ফইম আর সিরাজ। মামুদ শেখ মেয়ে সেজে আসরে ঘুরপাক খায়। মেয়ে দর্শকরা সিরাজ আর মামুদের নাচ দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। পুরুষরা হাত তালি দেয়। রগড় মন্দ নয়। প্রায়ই অনেক রাতে আলকাপিয়ারা ফিরে যায় নিজেদের ডেরায়।

ধান কাটা শেষ। মাঠের মাড়াই শেষ। ধান ঘরে তোলার পর মহরা আরম্ভ। নাগারে মহরা চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। তারপর বসে আসর। প্রকৃতির রোষ না থাকলে পরপর কয়েক রাত চলে অনুষ্ঠান। সভ্য ভাবে বললে, এর মাথা মুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবারও ভিড় জমেছে। হাসিম হারমোনিয়মের রিড্ টিপছে। ঢোলক বাজাচ্ছে লখা। হুসেন সবে হাঁড়ি উল্টে চাঁটি মারতেই জমে উঠল আসর, দোতারা হাতে ঢুকল নৈমুদ্দি, টুং টাং শব্দ মিলিয়ে গেল ঢোলক আর হাঁড়ির বাদ্যে। ফইম তখন পর্দারবিবি, মামুদ তার শাশুড়ি। নৈমুদ্দির পায়ে পা মিলিয়ে তারাও নাচতে থাকে। নৈমুদ্দি জিগীর দিল বিস্‌মিল্লা হে রহমানে রহিম সমবেত দর্শক নৈমুদ্দির সঙ্গে গলা মিলিয়ে জিগীর দিল বিস্‌মিল্লা হে রহমানে রহিম।

নৈমুদ্দি প্রশ্ন করল, কও তো পর্দারবিবি তোমার শাউড়ির খবর কি?

ফইম মাথার ঘোমটা আলগা করে উত্তর দিল ওরে হামার নাগর, কি খবর চাও?

নৈমুদ্দি গানের সুরে বলল, ফরিদের নানা নিকা করেছে আমিনার নানীকে।

মামুদ জবাব দিল, কি বলিসরে ঢ্যামনা! ফরিদের বিবি হল আমিনা? এমন নিকে হয় কি! নেক কাম?

নৈমুদ্দি গান ধরল, খোদার দোয়াতে সব হয় রে হয়। বাঘের

মাসী যদি বিড়াল হয়, ফরিদের নানা ক্যামনে নিকা করবে না আমিনার নানীকে।

দোহাররা সুর দিল, সে কেমন হয়।

নৈমুদ্দির গান উঠল চরমে। সে গাইতে থাকে।

ফরিদের নানা আমিনার নানীকে করল নিকা।
পীরিত জমল। এবার সবই হল ফিকা।
মিঞার ফোকলা মুখে পানের ছোপ,
আর বিবি গালে হাসিব টোপ।
আমিনার নানা?
আর বলিস নি।
নিকার ভাতারের ফোকলা হাসি,
দেখে বিবির বিষম কাশি-
হেসে কেশে খিস্তি করে নতুন ভাতারকে।

দোহাররা সুর ধরল নতুন ভাতারকে।

নৈমুদ্দির গান আর দোহারের বিকৃত সুর থামতে না থামতেই আলি হোসেন আসরে এসে প্রশ্ন করল, কও দেখি চাচা বিল চলনের স্বাদ কনে?

নৈমুদ্দি দোতারার টুং টাং সুর তুলে গান ধরল,

ওরে শালা তোর নানা
নিকা করে ঘর জামাই হল যে গাঁয়ে
সোজা ডহর উল্টা বাঁক
হুড়কো পেটায় হল কানা
সেই গাঁয়ে রে সেই গাঁয়ে।

আসর তখন জমে উঠেছে। দর্শকরা নৈমুদ্দির গান শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। আলি হোসেন জবাব দেবার আগেই একটা দমকা বাতাস ছুটে এল। দমকা বাতাসে মশালগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠেই প্রায় জমিন বরাবর হয়ে নিভু নিভু। এক রাশ বালি উড়ে এসে

আঁধার করে তুলল। মেয়ে-মরদ সব দর্শক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিল মেঘের খেলা।

সবার চোখে মুখে আতঙ্ক।

সবার প্রশ্ন।

কি হল চাচা? কি হল বড়মিঞা? কি হল হরোকাকা? কি হল ফেকুদাদা?

দেবতা আজ ব্যাজার। ঝড়! তুফান! চল সব ঘর চল। আশমানের চোখে আজ কালো ঠুলি। কাল বোশেখি। আসর বন্ধ। সবাই চল নিরাপদ জায়গায়।

কাল বোশেখি শুনেই সবাই ছুটল নিজের নিজের ঘরের দিকে। পেছনে পড়ে রইল আসর আর আসরের উদ্যোক্তারা। দেখতে দেখতে আসর খালি। আলকাপের দল তখন বাঁশের মাথা থেকে লণ্ঠন আর মশাল সামলাতে ব্যস্ত। আজকের রাতই বরবাদ। চরের মানুষ যেমন ভয় করে বন্যাকে তেমনি ভয় করে কালবোশেখিকে। চরে কোন বড় গাছ নেই ঝড় সামাল দেবার। বালির ঝড়ে দশদিক আঁধারও হয়ে গেল। মেয়েরা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ছুটছে। পুরুষরা গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে কোন রকমে এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরই ঝড়ের দাপট সহ্য করতে না পেরে অনেক খড়ের বাড়ি ভূমিশয্যা নেয়। আজও হয়ত অনেকের খড়ের চালা মাটিতে নুইয়ে পড়বে, অনেকের খড়ের চালা উড়ে গিয়ে বড় গাঙে ভাসতে থাকবে। ঝড়ের ভয়েই চরের মানুষরা নিচু করে ঘর ছাউনি করে। উচু ঘরে ঝড়ের ধাক্কা যেমন, বিপদও তেমন। বাঁশ-দরমা আর খড়ের কুটিরগুলোর ক্ষীণ পরমায়ু অল্পসময়ে লীন হয়ে যায়। এই সব কুটির কতক্ষণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। এত দুর্যোগ, কালবোশেখী, পদ্মার বান, শীতের প্রচণ্ড কনকনানি সহ্য করেও আজও বেওয়ারিশ চরে ঘর বাঁধে মানুষ, তাও বেঁধে যায় ওয়ারিশদের জন্য। প্লাবন এলে মাথায় হাত দিয়ে আল্লার দরবারে আর্জি জানায় না, তারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় ঝেড়ে ওঠে। মাথায় সম্পদ নিয়ে নৌকা

ভাসায়। বেহুলা ভাসানের গান গায়, ঢেউয়ের তালে তালে বৈঠা মেরে জারী গান করে, নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটতে থাকে। শহরকে রক্ষা করতে সরকার বাঁধ দিয়েছে, সেই বাঁধে আশ্রয় নেয়, বাঁখারি আর চট দর্মা দিয়ে ছাউনী করে, অপেক্ষা করে সুদিনের। প্লাবনের সাথে সাথে ভাঙ্গনও দেখা দেয় জায়গায় জায়গায়। এই জীবনের সঙ্গে চরের মানুষ অভ্যস্ত। ঝড়ের সুচনা লালচে মেঘ দেখলেই ছুটে পালায় নিজেদের আস্তানায়।

আসর খালি। পেছনে কে রইল তা দেখার লোকও নেই। কিছুক্ষণ আগে যে জায়গা ছিল জমজমাট। মানুষের কলরবে মুখর, সে জায়গায় আর কেউ নেই রয়েছে আড়াআড়ি বাঁধা কয়েকটা বাঁশ।

দেখতে দেখতে শোঁ-শোঁ শব্দ করতে করতে ছুটে এল প্রচণ্ড ঝড়। তোলপাড় করল গোটা চর। হাসিম ছুটেছিল তার হারমোনিয়াম মাথায় করে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠল মাঝের গায়ের এনায়েত ফকিরের বাড়িতে। লখাও ছুটতে ছুটতে পাশের গায়াল ঘরে ঢুকেই বাশের খুটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে কোনরকমে হাত আড়াল কবে আগুন দিল তাতে।

এনায়েত ফকিরের কত বয়স তা বলা কঠিন। বয়স যতই হোক দেহটা এখনও শক্ত সমর্থ। তার বয়স জিজ্ঞেস করলে বলে সেই যেবার পদ্মায় জাহাজ ডুবি হয়েছিল সেবার আমি রহিমচাচার কোলে চড়ে জাহাজ দেখতে গিয়েছিলাম। তা বয়স হবে তিন কুড়ি কিম্বা চার কুড়ি, তোমরাই হিসাব করে নাও।

এনায়েতের বিবি করিমন মরেছে সেইবার যেবার পদ্মায় ভীষণ বান হয়েছিল, সেই বানে এনায়েতের পেয়ারের বিবি ভেসে গিয়েছিল তার আগের আস্তানা উনিশ বুড়ির চর থেকে। জলের তোড়ে উনিশ বুড়ির চর ডুবল। ডুবল এনায়েতের ঘর সংসার, নৌকায় উঠবার অবসর পেলেও করিমন নৌকায় উঠতে পারেনি, পা হড়কে ভেসে গিয়েছিল বানের জলে। পরের দিন করিমনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল

পদ্মার কিনারায় বালি কাদার ঢিপিতে। তখনও তার কোলের গেদা ছেলে বুকের ওপর মুখ রেখে মায়ের দুধ খাবার বৃথা চেষ্টা করছিল। করিমনের লাশ বালির তলায় চাপা দিয়ে কচি বাচ্চাটাকে বুকে করে কয়েকমাস পথে পথে ঘুরে শেষ অবধি হোগলবাড়িয়ার নতুন চরে এসেছিল, সেও তো এক কুড়ি বছর আগে। বেওয়ারিশ জমির ভাগ বাঁটোয়ারা করে এনায়েত স্থায়ী আস্তানা করে নিয়েছিল মাঝের গাঁয়ে।

মাঝের গাঁয়ে এসেই এনায়েত নিকা করেছিল ফেলানিবিবিকে।

ফেলানিবিবির প্রথম স্বামী মরেছিল ওলাওঠায়। বিরহ কাতর ফেলানি ছয়মাসের মধ্যেই হুরমুত শেখের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল কিন্তু তাও সহ্য হল না। হুরমুত যখনই বুঝল ফেলানি বন্ধ্যা তখনই তালাক দিয়ে নতুন বিবির খোঁজে লোক পাঠাল। এসব খবর থেকে এনায়েত বুঝেছিল মা-হারা ছেলেটাকে ফেলানির কোলে তুলে দিলে অযত্ন হবে না। যদি মন বদল হয় তাহলে নিজের ছেলের মতই মানুষ করে তুলবে। আবার ফেলানি তালাক পেয়ে বড়ই অসহায় অবস্থায় অন্যের দরজায় ঘুরছিল পেট-ভাতার জন্য। এনায়েত তাকে যে ভিক্ষার হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে এটা বুঝেই ফেলানি সহজেই নিকা করতে রাজি হয়েছিল।

ফেলানির বাপ-ভাই কেউ নেই। নতুন করে ঘর না বাধলে পেটে দানাপানি যোগাড় হবে না। অনেকেই বলেছিল, খেটে খুটে খা ফেলানি। আর ঘর বাঁধিস না। ফেলানি হেসে বলেছিল, গেরস্ত বাড়িতে মজুর খাটার চেয়ে স্বামীর ঘরে খেটে খাওয়া অনেক ভাল। কেউ তো বসে ভাত দেবে না। সব জায়গাতেই খাটতে যখন হবে তখন সোয়ামীর ঘরেই খাটব। এতে ইজ্জত আছে, লোকে বলবে ফেলানি মিঞার বিবি। গেরস্ত বাড়িতে বলবে, অমুকের চাকরাণী। কোনটা ভাল।

উকিল-মওলবী সাক্ষী রেখে ফেলানি তৃতীয় স্বামী এনায়েতের হাত ধরে মাঝের গাঁয়ে এসে উঠল।

চরের মেয়েদের রূপের হিসাব কেউ করে না। তাদের রূপের চেয়ে তাদের গতর মূল্যবান। ঘরের পুরুষরা খোঁজে গতরের সামর্থ্য, চরের চাষীর ঘরে মেয়েদের কাজ করতে হয় বেশি। তাই জোয়ান মেয়েদের ঘরে আনতে চায় গেরস্তরা।

এনায়েত মাঝে মাঝে বলে, বিবি তোর যা জোয়ানি, আমার ঘরে তোর মন টিকবে কি! ভাল কোন পাত্তরের খোঁজ পেলে বলিস, আমি তোকে খালাস করে দেব, সুখের ঘর পাবি।

ফেলানি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, মরণ! তোর বুঝি মন উঠছে না?

রাগ করিসনি ফেলানি। আমার ঘরে ছাওয়াল আছে, গরু আছে, এবার জরু এল কিন্তু তোর কি আছে? কোল যে তোর খালি। তাই বলছিলাম।

তোর মুখে আগুন, বলেই ফেলানি হেসেছে। আবার বলেছে, আমার কি অভাব পেটে না ধরলেও ফরিদ তো আমারই ছাওয়াল। আমাকে মা বলেই তো ডাকে।

সবাই বলে এনায়েত আর ফেলানি মাণিক জোড়, প্রশংসা করে ফেলানির। ফরিদকে যেভাবে বড় করেছে তা সবাই সহ্য করতে পারেনি। তাই ফিসফিসানি চলে মেয়ে মহলে, তবে গুরুতর কিছু নয়।

এনায়েত আজ আলকাপের আসরে যায়নি। ফেলানি গিয়েছিল। ঝড় উঠতেই পালিয়ে এসেছে। মেঝেতে চাটাই পেতে এনায়েত বসে বিড়ি টানছিল। ছুটে এসে এনায়েতকে জাপটে ধরল ফেলানি।

কে ফেলানি! ভয় পেয়েছিস বুঝি? জিজ্ঞাসা করল এনায়েত।

ফেলানি হেসে বলল, তা বটে। যা তুফান। তুফানকে বড় ভয়।

কেন রে?

এই তুফানেই তো করিমন ভেসে গেছে। ভয় হয়। পাছে আমিও ভেসে যাই, বলেই আবার থামল ফেলানি। অন্ধকার ঘরে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, তবে একজনের গরম নিঃশ্বাস

আরেকজন অনুভব করছিল। ফেলানি আরও কিছু বলার চেষ্টা করছিল এমন সময় ঝাঁপ ঠেলে হাসিম ঢুকল ঘরে।

এনায়েত প্রশ্ন করল, কে বে?

আমি, আমি হাসিম।

তুইও পালিয়ে এসেছিস, ভাল, ভাল। হ্যারিকেনটা জ্বাল বিবি, হাসিমকে বসতে দাও।

অনেক কষ্টে ফেলানি দেশলাই খুঁজে হ্যারিকেন জ্বালাল। এনায়েত আরেকটা চাটাই এনে দিল হাসিমকে বসতে। চাটাই পাততে পাততে বলল, তোদের আসর আজ জমতে জমতে জমল না, তাই না?

হ্যাঁ চাচা।

ফেলানি বলল, এমনটা তো হর সালেই হয়।

নসীব চাচী নসীব! তবে কাল যদি আকাশটা ফিকে হয় তা হলে কাল আসর জমাব। হর বোজ তো ঝড় উঠবে না। কাল আমাদের মূল গায়েন, তোমাদের ব্যাটা ফরিদ আসবে খবব দিয়েছে।

ফেলানি বলল, ঠিক বলছিস তো। আমাদের কোন খবর তো দেয়নি।

খবর কারও হাতে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে, সে এখনও তোমাকে জানাতে পারেনি। তাও যদি দুর্যোগ না হত তা হলে অবশ্যই খবর পৌঁছে যেত। ফরিদই আমাদের ভরসা। সে থাকলে নতুন নতুন গান বাঁধত, সুর দিত। আর সে আসরে নামলে সবাই বাহবা দিত, ফেরির পয়সা হত। দেখি কাল কি হয়। আমার বিশ্বাস ফরিদ নিশ্চয়ই কাল আসবে।

হাসিমের কথা শেষ হতেই ফুঁসিয়ে উঠল ফেলানি। বলল, ফরিদ তো বিবাগী হবার মত ছেলে নয়। অই মাগী হাসিনা। অই ফরিদের সর্বনাশ করল, আমাদেরও। ঘর করল নাই ঘর ভাঙল। আমার ছাওয়াল বিবাগী হল। বল তো হাসিম, এমন মাগীকে সহ্য করা যায়। আল্লার রসুল মাগীকে ক্ষমা করবে না। তবে তোরা

তো সবই জানিস। ফরিদের নানার সঙ্গে হাসিনার নানীর নিকা তো তোরা দিলি আজকের গাওনায়। আবার পুছ্ করছিস কেন?

আহা ব্যাজার হও ক্যান চাচী। ফরিদের নানা তো কবরে। আমিনার নানী যে কোথায় তাও কেউ জানে না। ওটা আলকাপী গান গোস্‌সা হলে কি চলে। আলকাপী গানে কি ঘরের খবর থাকে। আমরা গান বাঁধি, রঙ্গ করি লোক মজাতে। কারও ঘরের কথা নিয়ে কেচ্ছা করি না।

বুঝিরে বুঝি। তবে তোর গান বড় মিঠা। আমাব ফরিদ! তার মত কজন। যেমন নাচতে তেমন খাসা তার গানের গলা। চুলায় গেছে হাসিনার পাল্লায়। কতবার মানা করেছি, ফরিদ, অই মাগীটার কথা শুনিস না, অর বাপ্ একটা চামার। চামারের বেটিরে বিহা করিস না। শুনল না আমার কথা। বিয়ে করলি ঘর কর। আল্লার কসম, মাগী ঘর করাব মেয়েই নয়। মাগী যে পয়সা লালচে আমার ছাওয়ালরে পথে বসাবে তাতো ভাবতেও পারিনি। নসীব রে হাসিম নসীব, আমাব অমতেই ফরিদ গেল টাউনে, এখন ভুগছে।

হাসিম অবাক হয়ে বলল, অতো তো জানি না চাচী। তোমার মত শাউড়িকে রেয়াত করেনি হাসিনার মত মেয়ে এতো আশ্চর্য কথা।

ফেলানিবিবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই হয় রে তাই হয়। তবে আমি তাকে অযতন করিনি, কষ্ট দেইনি। ভালই রেখেছিলাম আমার ঘরে।

ভাল করে দেখা না গেলেও হাসিম বুঝতে পারল ফেলানিবিবি চোখ মুছছে।

ফেলানিবিবি চুপ করে গেল। অন্ধকারে তাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। শোনা যাচ্ছিল তার ফোঁসফোঁসানি নিঃশ্বাসের শব্দ। এনায়েত ফকির এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। চাটাইয়ের এক ধারে শুয়ে শুনছিল তাদের কথা। ফেলানিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই

যে বড় ফোঁপাচ্ছিস ফেলানি। হাসিনা ভেগেছে। এবার ফরিদ একা। কাল তোর কোলের ছেলে কোলে ফিরবে, বুঝলি !

এনায়েত চুপ করে গেল।

শুধু শোনা যাচ্ছিল ফেলানির ফোঁপানি।

ঝড়ের বেগ কমতেই হাসিম উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাস বাপ্। এখনও ঝড় থামেনি।

ঝড় থেমেছে চাচী। ওরকম হাওয়া-বাতাস চরে সব সময়ই থাকে।

পানি পড়ছে রে হাসিম জোর পানি। একটু থেমে যা।

হাসিম আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, তুফানও গেছে, পানিও থেমে গেছে। এবাব চলি চাচী।

বেরিয়েই হাসিমের মনে পড়ল লখার কথা। তার সঙ্গে লখাও তো এসেছিল। খুঁজতে খুঁজতে দেখল লখা গোয়ালের বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে তখনও ঘুমোচ্ছে। হাসিম ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গাল। বলল, চল লখা, ঘরে চল। তুফান-পানি থেমে গেছে। আর দেরি করিস না। আশমানে তারাও ফুটেছে।

সেদিনের আসব অসময়ে ভেঙ্গে গেলেও সকালবেলায় আকাশ পরিষ্কার দেখে হাসিম উৎসাহিত হল। দলবল ডেকে দুপুর থেকেই তোড়জোড় আরম্ভ করল গতরাতের আলকাপ গানের শেষটুকু গাইতে। দরকার মনে কবলে, নতুন করে আরম্ভ করবে।

নুরু এসে খবব দিল, ফরিদ এসেছে হাসিম ভাই।

হাসিম জানত ফরিদ আসবে। খবরে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও উৎসাহিত হবার মত উপাদান ছিল যথেষ্ট।

ভাল কথা। তুই ছুটে যা নুরু। এনায়েত চাচার বাড়ি থেকে ফরিদকে ডেকে নিয়ে আয়, বলবি আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করছি।

ছুটতে ছুটতে নুরু গেল এনায়েত ফকিরের বাড়ি। ফরিদকে সামনে পেয়েই বলল, চল ফরিদ ভাই।

কোথায় ?

হাসিম ভাই তোমাকে তলব করেছে। জলদি চল।

আমার গতরটা ভাল নেই রে, নুরু। হাসিমকে বলিস, সাঁঝের বেলায় যাব। গান হবে তো সন্ধ্যার পর। ঠিক সময় মতই যাব।

উঁহু। গান শুনতে তো সবাই যায়। অন্য কাম আছে, তাড়াতাড়ি চল।

ফরিদ না ভেবেই বলল, তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি। এই আধ ঘণ্টা পরে।

যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি ছুটে ফিরে গেল নুরু।

নুরু যখন খবরটি দিল তখন হাসিম আর আনোয়ার আসরে পোয়াল বিছিয়ে ভেজা বালির ওপর চাপান দিচ্ছিল।

মুখ তুলে হাসিম জিজ্ঞেস করল, কত দেরি হবে?

নুরু আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখাল, উইযে, ফরিদ ভাই আসছে। এখুনি এসে যাবে।

ফরিদ তখনও কিছুটা দূরে। খোলা নদীর চরে অনেক দূরে দৃষ্টি যায়। নুরু ঠিকই দেখেছিল, ফরিদ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। হাসিম উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইল, ফরিদ কাছে আসতেই ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, তুই এসে বাঁচালি রে ফরিদ। নৈমুদ্দির গলা বসে গেছে। তোকেই আজ মূল গায়েন হতে হবে। বুঝলি।

বুঝলাম। এর জন্যই জোর তলব! ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, বললেই কি বিয়ে হয়। গান বললেই কি গান হয়। মহরা দিতে হয়, গলা ঠিক করতে হয়, দোহারদের সাথে সুর ভাঁজতে হয়, আরও কত কি! তোদের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। রাস্তা থেকে মানুষ ধরে এনে তাকে করবি মূল গায়েন। যত সব বাজে কথা।

রাগ করিস না ফরিদ। তোর আবার মহরা। মুখে মুখে সুর তুলে ছড়া কাটার ওস্তাদ তো তুই। দশ গাঁয়ের মানুষ চেনে তোকে। তবে সুর দিবি ভাওয়াইয়া। আমরা বাজনা মিলিয়ে দেব।

তুই তো হাকিম, হুকুম দিয়েই খালাস। আমি হলাম পেয়াদা, হুকুম তালিম করার ক্ষমতা তো যাচাই করে দেখবি।

তুই পারবি রে ফরিদ। তোর গলা শুনেই তো হাসিনা তোর তরে পাগল হয়েছিল। শেষে বিয়েও করেছিল। সবাই বলে গানের কত মাহাত্ম্য। হাসিনাবিবি গানের তরেই বিয়ে করল ফরিদকে।

বিবি হয়েছিল, বলে ফরিদ হাসল। হাসিতে ফুটে উঠল বেদনা। আবার বলল, ছিল, হ্যাঁ হয়েছিল। এখন আর নেই। খবিরুদ্দির খপ্পরে পড়ে মাগী আর নেই। পালিয়েছে পয়সার লোভে। গানের চেয়ে পয়সার আকর্ষণই জোরদার। বুঝলি।

শুনেছিলাম, তুই তালাক দিয়েছিস।

না রে, না। উড়া পাখি খাঁচায় ভর্তি করা যায় না। ফুসলে নিয়ে গেছে। আর তালাক? ওটা না বললেও চলে। তালাক না দিলে ভিন্ ঠাঁইয়ে জান দিতে হত।

থানায় যাসনি কেন?

থানায় গেলে বউ ধরে এনে দিত। বউ পেতাম, হাসিনাকে পেতাম না ভাই। ওর মন মজেছিল খবিরের পয়সা দেখে। আমি টমটম গাড়ির গাড়োয়ান আর খবির রহিস আদমী। হাসিনার সখ আর ফরমাইস মেটানো আমার সাধ্য ছিল না। নতুন নতুন শাড়ি, রেশমী চুড়ি, বেলাউজ, আরও কত কি। আমি তো তার চাহিদা মেটাতে পারিনি। গান শুনে মন মজে, পেট ভরে না। মন মজাতে আর পেট ভরাতে পয়সার দরকার। আমার তো কিছুই ছিল না। সবই খোদার মর্জি। সব মেনে নিয়েছি ভাই।

ফরিদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হাসিম কিছু বলার মত কথা খুঁজে পেল না।

যাদের পয়সা আছে, বলেই ফরিদ হাসিমের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, তাদের সব আছে। বিবি চাও? পাবে। যে পথের কাঁটা, তার জান যাবে। কোনটা ভাল তাই এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

নুরু ছুটে এসে বলল, আজ ফরিদ ভাইয়ের আসর।

কপালে হাত ঠেকিয়ে ফরিদ বলল, যদি নসীবে থাকে তা হলে

আসর জমবে। তোরা আমাকে ছুটি দে। মা নাস্তাপানি নিয়ে বসে আছে। বাড়ি হয়ে আসছি।

সন্ধ্যা পেরোতেই লোক জমায়েত হতে থাকে। কেউ কেউ আকাশের দিকে বার বার তাকিয়ে আশা প্রকাশ করে আজ আর কিছু বিঘ্ন ঘটবে না। দেখতে দেখতে মাঝের গাঁয়ের সামনের ময়দান লোক ভর্তি হয়ে যায়। আলকাপিয়ার দলও এখন প্রস্তুত।

আজকের আসরে অনেকদিন পর ফরিদ এক পায়ে নুপুর বেঁধে ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করতে করতে উপস্থিত হতেই দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে জিগির দিল। সত্যি সত্যি ফরিদ আসর মাত করেছিল সে-রাতে। আগের রাতের আপশোষটা মিটিয়ে শ্রোতারা অবাক হয়ে শুনছিল ফরিদের গান।

ফরিদ পহেলা গান ধরল,

> বিবি ছিল হুরী জিন্নতের পরী
> বরাত মন্দ,
> বিবি বলল,
> মিঞার গায়ে গন্ধ।
> নাগব যখন ধরল তখন
> তোর কপালে নুড়ো জ্বেলে
> বাচ্চা নিয়ে কোলে
> যাব তোকে ফেলে।
> চোখের পানি ফেলবি রে তুই
> সুখের পায়রা হব রে মুই।

ফরিদ গাইতে গাইতে নাচছিল। হঠাৎ থেমে গেল তার গান। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল সে। বাজনার তালে তালে পা ফেলছিল। হঠাৎ গাল বেয়ে চোখের জল নামতেই দর্শকরা অবাক হল। বিরহ বেদনার মূর্ত প্রতীক ফরিদকে যারা জানত তারাও চোখ মুছতে থাকে। আনন্দের এই আসর বেদনার রাজ্যে পরিণত হল।

কিছুক্ষণ মাত্র।

ফরিদ নিজেকে সামলে নিয়ে নতুন গান ধরল। আসরের চেহারাও বদলে গেল।

এতক্ষণ ফরিদ ছিল মৃত, হারিয়ে গিয়েছিল কোন অজানার মাঝে। হাসিনাকে হারিয়ে মানসিক স্থবিরতা হারিয়ে হয়ে পড়েছিল অন্য জগতের মানুষ। বোধহয় সে নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে নতুন গানে সুরে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেই আসরের চেহারা বদল হয়ে গেল। বার বার আসরে এসে গান করে আর নেচে ফরিদ ক্লান্ত। শেষরাতে আসর ভাঙ্গতেই আসরে বিছানো পোয়ালে গা এলিয়ে দিল। ভিন গাঁ থেকে যারা এসেছিল তারা আর ফিরে যায়নি, তারাও পোয়ালের গাদায় শুয়ে পড়েছিল। যারা নৌকায় এসেছিল, তারাও বাড়ি ফেরেনি, ঘাটে নৌকা বেঁধে পাটাতনে শুয়ে রাত কাটাল।

সকালবেলায় ভিন গাঁয়ের মানুষ ফিরে গেছে। ফরিদ আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বসল নদীর কিনারায়। দুপাশে বালির চর, পেছনে মাঝের গাঁয়ের খড়ের কুটিরের সারি, সামনে তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে পদ্মা, কখনও জননী, কখনও রাক্ষসী। বালিব চরে বসে আকাশের দিকে তার নজর। নদীর কিনারায় চর ধীবে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেছে, একাই বসে আছে ফরিদ। কে যেন ধীরে ধীরে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। বেখেয়ালী ফরিদ পায়ের শব্দও শুনতে পায়নি। ফরিদকে ডেকে বলল, ওঠ, ঘরে চ ফরিদ।

বেখেয়ালী ফরিদ গলার শব্দে পেছন ফিরেই দেখল তার সৎমা ফেলানিবিবিকে।

তুই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিস মা!

হ্যাঁ, তোর বাপজান তোর তরে ঘর-বার করছে। ঝড়-তুফানের দিন, কখন কি হয় তার ঠিকানা নেই। ঘরে ফিরেছে সবাই, তুই বাদ। চিন্তা তো হবেই। বিহান বেলায় দরগায় মানত করে বাড়ি থেকে আসছি। চল, আর দেরি করিস না।

ফরিদ বাদ প্রতিবাদ করল না; কথাও বলল না। উঠে দাঁড়াল।

আনমনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে বলল, তুই ঘরে যা মা। আমি আর যাব না। চাঁইদের নাও চেপে শহরে যাব পুরানো হিসাব মেটাতে। আমার কিছু পাওনা আছে, পাওনাটাকে আনতে যাব। বা'জানকে বলিস আমি বিকেলের নাওতে ফিরে আসব। তোরা ভাবিস না যেন।

তোর বাপ কিন্তু ক্ষেপে যাবে। কোন কথাই মানবে না। আমাকে দুষবে। অনেকদিন পর গাঁয়ে এসে আবার ফিরে যাবি, সেটা কি ভাল! তুই তোর বাপ্‌কে বুঝিয়ে যা হয় করিস। এখন তো ঘরে চ।

ফরিদ অসারের মত বলল, বেশ চ।

এনায়েত নাম মাত্র আপত্তি করে সম্মতি দিল শহর যেতে। ফরিদ চাঁইদের নৌকার সোয়ারী হতে ঘাটে গিয়ে হাজির হল।

চাঁইদের রামু মণ্ডল নৌকা নিয়ে প্রস্তুত। যাত্রীদের প্রায় সবাই নানা বয়সের মেয়ে, তাদের সঙ্গে আনাজ তরকারীর বড় বড় ঝাঁকা। সবে মাত্র খুঁটোতে হাত দিয়েছে নৌকার দড়ি খুলতে এমন সময় ফরিদ এসে বলল, আমি শহরে যাব রামুকাকা।

ফরিদ নৌকায় পা দিতেই রামু জিজ্ঞেস করল, কখন ফিরবি? আজ তো আবার আলকাপের গাওনা আছে।

বিকেলেই ফিরব একটু বেলাবেলি। আজ বোধহয় আলকাপের গাওনা হবে না কাকা। হাসিম তো কিছু বলল না।

সে কি রে! আমাদের মুংলী, শশীবালা তোর গান শুনে খুব তারিফ করেছে। সবাই বলছে ফরিদ ছিল না, আলকাপের জমাটি আসরও ছিল না। তুই এসেছিস হোগলবাড়িয়া চরের তিনটে গাঁ চাঙ্গা হবে রে। আমরা তো তোর কথাই ভেবেছি, না রে মুংলী?

মুংলী তার ঝাঁকায় ঠেসান দিয়ে বসেছিল। পদ্মার ঢেউয়ের তালে তালে নৌকা দুলছিল। রোজকার মতই দুলুনিতে চোখ বুঁজে ঝিমোয় মুংলী। আজও ঝিমোচ্ছিল। রামুর ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, হাঁরে হাঁ। তুই জানিস না, আমাদের হোগলবাড়িয়ার গোটা চর শুকনো

বালির মত চিক্ চিক্ করলেও রস ছিল না। তুই তো রসরাজ। এবার সোহাগের বান ডাকবে।

মুংলী মাঝ বয়সী মেয়ে। শহরে নিত্য যাতায়াত। শহরের অনেক ধাঁচ শিখেছে। রসিকাও বটে। ফরিদ মুংলীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল দেখিস, ভিরমি খাস না যেন। সোহাগের বানে ভেসে যাস না যেন।

শহরের হাটে বাজারে মুংলী যেতে অভ্যস্ত। খদ্দেরদের সঙ্গে দর কষাকষি করে, রঙ্গ করে, রঙ্গের কথা শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। চলিয়ে বলিয়ে মাঝ বয়সী, যৌবন তখনও থিতিয়ে যায়নি। ফরিদের কথা শেষ হতেই মুংলী বলল, তা বটে, ভিরমি খেয়েছিল হাসিনা ছুঁড়ি। এবার কে ভিরমি খাবে রে ফরিদ ?

ফরিদ বলল, তোদের চাঁইপাড়ায় জোয়ান মেয়ের অভাব নেই। তাদের কেউ যদি ভিরমি খায় তা হলে আমাকে কিন্তু দুষবি না। তবে মিঞা বাড়ির মেনিমুখো মেয়েরও তো অভাব নেই।

মুংলী বলল, চাঁইপাড়ার মেয়েরা ভিরমি খাবে কোন দুঃখে। একটা বউকে ভাত দিয়ে পুষতে পারলি নে। তোর মত নির্মর্দা পুরুষের নজরটা চাঁইপাড়ায় আর দিসনে। চাঁইপাড়ার কথা ভুলে যা। চাঁইরা ভিরমি খায় চাঁইদের ঘরে। ছোলেমানের বিটি তরি, তারে তো চিনিস। তোর গানে তরি মজেছে। এবার উঁকিঝুঁকি দে ছোলেমানের ঘরে। নসীব খুলে যেতেও পারে। ছুঁড়িটা লায়েক হবার আগেই হাসিম ঘুরঘুর করেছে, এবার লায়েক হয়েছে, হাসিমের ফায়দা উঠাবার আর রাস্তা নেই। তুই একবার চেষ্টা কর ফরিদ।

ফরিদ নৌকায় ভাল হয়ে বসে গান ধরল :

দরিয়ার পানি ছুটছে রে বিবিজান।<br>তরি বিবিকে দেখে হাসিম লবে জান।

বুঝলি রে মুংলী, ওদের মন মজেছে। আমার ওপর নেকনজর দেবার ফুরসৎ নেই। তার চেয়ে চাঁইপাড়ায় ঠাঁই করব ভাবছি। তোর মত কাউকে পেয়ে যাব নিশ্চিত।

হুর্-হুর্। তোর গলা মিঠে, গতর তিতা। চাঁইপাড়ায় তোর আশা নাই। যাস না যেন। বিবিজান মিলবে না লবেজানও হবে না।

ফরিদ হাসতে হাসতে বলল, আমার বিবিজানই তো লবেজান। দেখছিস না আমার জানটা কয়লার মত কালো করে দিয়েছে।

মুংলী হাসল। হাসল নৌকার সব যাত্রী। এরা সবাই শহর ঘোরা মানুষ। রঙ্গরসে পিছিয়ে পড়ে না কখনও। হাসির দমক শেষ হতে না হতেই নৌকা শহরের ঘাটে পৌঁছে গেছে। রামু একটা বিড়ি ধরিয়ে নৌকার দড়ি ধরে লাফিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়। সবাই প্রস্তুত হল ঝাঁকা ডালা মাথায় নিয়ে ঘাটে নামতে।

মুংলী হাসতে হাসতে নেমে গেল। যাত্রীরা সবাই নেমে গেলেও ফরিদ যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। নৌকা থেকে নামবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রামু মণ্ডল জিজ্ঞেস করল, তুই যাবি না ফরিদ ?

ফরিদ গম্ভীরভাবে বলল, না কাকা।

তুই যে বলেছিলি অনেক কাজ আছে শহরে।

যাব মনে করেই এসেছিলাম কাকা। এখন ভাবছি না এলেই ভাল করতাম।

তাতো বুঝলাম। আমরা তো ফিরব সেই বেলা পড়লে। ততক্ষণ নৌকায় বসে তুই কি করবি ? কি খাবি ?

খাব দরিয়ার পানি।

ওলাওঠা হবে রে, হতভাগা। তোর মায়ের মত মরতে চাস বুঝি। ওই কলসীতে জল আছে, আমার তো খাবার আছে রাতের পান্তা আর পেঁয়াজ। তোর কি তাতে চলবে ? বেশ, আমি মুড়ি চিড়ে নিয়ে আসছি। খেয়ে দেয়ে পাটাতনে শুয়ে থাকিস, কেমন ?

তুমি কোথায় যাবে ?

তোর কাকির বায়না, পাছাপাড় শাড়ি চাই, অন্য কিছু সওদাও করতে চাই। তুই নাওতে থাকলে আমি শহরে ঘুরে আসতে পারি। আর যদি খ্যাপ্‌ পাস তা হলে নগদ কিছু রোজগারও হতে পারে।

ঘোড়ামারা চরের মানুষ আসে মাঝে মাঝে। এক দণ্ডেই এপার ওপার করতে পারবি। মাথা গুণতি পয়সা নিবি, বুঝলি। সরকারী ঘাটে চার পয়সা, তুই আট পয়সা নিবি।

ফরিদ মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে নৌকার গলুইতে গিয়ে বসল। রামু মণ্ডল নেমে গেল নৌকা থেকে। আধ ঘন্টার মধ্যেই এক ঠোঙ্গা মুড়ি আর চিড়ে হাতে করে এসে বলল, খা। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি। কোথাও যদি যেতে চাস তা হলে নৌকায় তালাচাবি দিয়ে যাবি, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসবি। কেমন ?

গতরাতে আলকাপের আসর শেষ হতে দেরি হয়েছিল, ভাল করে ঘুমুতে পারেনি। শরীরও ম্যাজ ম্যাজ করছিল। মুড়ি চিবিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে পাটাতনে শুয়ে পড়ল ফরিদ। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল মেয়েদের গলার শব্দে।

কলরব করে মেয়েরা ডাকছিল, এই হালাদার, এই হালাদার।

ফরিদ চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসেই অবাক হয়ে দেখল একদল অচেনা মেয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। জিজ্ঞাসা করল, কি চাই তোদের ?

মেয়ের দল ফিক্ ফিক্ করে হেসে বলল, পারকরে দিবি হালাদার।

কোথায় যাবি ?

ঘোড়ামারার চরে।

যাব। দু' আনা মাথা পিছু দিতে হবে।

ফেরীওলা চায় পয়সা নেয়।

ওদের কাছেই যা।

ছয় পয়সা করে দেব, যাবি ?

তোরা যখন বলছিস তখন তাই দিস।

কিন্তু কোলের ব্যাটাবিটি মাগনা।

ফরিদ গুণে দেখল বাচ্চার সংখ্যা তিন, বড় আটজন। বার আনা পয়সা। বলল, দে বার আনা, ওঠ্ নাওতে।

পয়সা মিটিয়ে সবাই উঠল নৌকায়। ফরিদও খুঁটো তুলে নৌকা ভাসাল। ডানে বাঁয়ে কাত হয়ে নৌকা চলল সোজা হয়ে উজানে। দোলানিতে মেয়েরা একজন আরেকজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। কিছুটা উজানে গিয়ে নৌকার মুখ ঘোরাল ভাটির দিকে।

নৌকায় বসেই মেয়েদের একজন বলল, তুই কি পাকা হালাদার? নৌকা ডুববে না তো?

ফরিদ হেসে বলল, ডুবলে তোদের সাথে আমিও ডুবব নানী। তোর নাতি তোর সঙ্গে পানির তলায় শুয়ে বেহেস্তের পথ খুঁজবে। ইনশাল্লা, না ডুবলে নানীর বাড়িতে আমার রাতের খানা।

আরেকজন বলল, ওরে নছিরণ তোর নাতি তো বেশ রসের মানুষ।

নছিরণ বয়স্কা মহিলা। মুখঝামটা দিয়ে বলল, ব্যঙ্গ করিস না সলিমা, তোর নানার হাজারো নাতি নাতনী। তার হিসাব নাই। তোর নানা ছিল চরের নবাব। গণ্ডায় গণ্ডায় বিবি বাঁদি নিয়ে ঘর করত। কার ঘরে কার পয়দা কে জানে। ছুনিয়া ভর্তি তার নাতি নাতনী, ছড়িয়ে আছে চরের গাঁয়ে গাঁয়ে।

ফরিদ এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। কোন জবাব দেয়নি। হাতের বৈঠা এক পাশে রেখে বলল, কি বলছ নানী। নবাবের বিবি বাঁদীর বাচ্চাদের তো তুমি জাতে তুলে নিলে। বাঁদিদের বাচ্চারাও এখন বিবি তালাস করছে পদ্মার চরে।

নছিরণের মুখ শুকিয়ে গেল।

তছলিমা মুখ ঘুরিয়ে বসল। তছলিমার বয়স কম। চেহারায় বোঝা যায় না সে বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা। অন্যান্য মেয়েদের মত মাথায় কাপড় সে দেয় না। গায়ের রং ময়লা, দেহটা পুরুষ্টু, হাসলে গালে টোল পড়ে। এতক্ষণ ফরিদ মাঝে মাঝে তছলিমাকেই দেখছিল। মুখ ঘুরিয়ে বসাতেই তার ঠোঁটে দেখা দিল মৃদু হাসি।

কি গো হালাদার নাও বন্ধ করলি কেন? জিজ্ঞাসা করল খালেদা।

তোদের কথা শুনছিলাম ; বলেই বৈঠা হাতে তুলে নিল ফরিদ।

কোন গাঁয়ের লোক গো তুমি ?

হোগলবাড়িয়ার মাঝের গাঁয়ের।

খালেদা বেশ আগ্রহ সহকারে বলল, তাই নাকি! মাঝের গাঁয়ে গতরাতে আলকাপের জমায়েত হয়েছিল। আমাদের গাঁয়ের যারা গিয়েছিল তাদের মুখেই শুনেছি ওখানে কোন এক ফরিদ নাকি জব্বর গান করেছে।

ফরিদ বলল, আমরাও তাই শুনেছি বিবিজান।

আমাদের গাঁয়ের মানুষ কেমন যেন, ওসব জমায়েতে যায় না কখনও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে খালেদা মন্তব্য করল।

ফরিদ কোন জবাব না দিয়ে সোঁতের জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

সব চুপচাপ।

ঘাটে নৌকা ভিড়তেই ফরিদ ডেকে বলল, ঘাটে এসে গেছি নানী। সাবধানে পা দিস। চোরাবালি থাকতে পারে। তবে বাড়ি যেতে যেতে বিবি বাঁদীর কথাটা যেন ভুলে যাস না। ভুললেই চোরাবালিতে পা পড়বে।

ফরিদের ঠাট্টা শুনে সবাই হেসে উঠল। নছিরণের দিকে চোখ টিপে বলল, তোর ভালই নাতি জুটেছে নছি।

ঘাটে নৌকা ভিড়তেই দু'টো জোয়ান ছেলে এগিয়ে এল ওপারে যাবার প্রত্যাশায়। তাদের মধ্যে একজন ফরিদকে দেখেই বলে উঠল, আরে ফরিদ যে। কাল তোর গান শুনলাম। আচ্ছা গান গেয়েছিস। আজ বুঝি জমায়েত হবে না, তাই বুঝি নৌকা নিয়ে বেরিয়েছিস!

ফরিদ কোন উত্তর না দিয়ে খোঁটা পুঁতে নৌকা বাঁধার চেষ্টা করছিল। নছিরণের চোখ তখন কপালে উঠেছে। কালো মুখটায় রক্তের ঝলক দেখা গেল। আঁচলে মুখ ঢেকে কোন রকমে ডাঙ্গায় পা দিয়ে ঘরের দিকে দিল ছুট। খালেদার মুখেও কথা নেই। সেও ছুটল নছিরণের পেছন পেছন।

ফরিদ মনে মনে হাসল। নতুন যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করল, তোরা যাবি নাকি? কোথায় যাবি?

যাব তোদেরই গাঁয়ে। আজ রাতে আলকাপ হবে কি? যদি হয় রাতটা ওখানে কাটাব রে ফরিদ। কুটুম বাড়ি আছে গাজিপাড়ায়।

আমার নাও যাবে শহরের ঘাটে। এ নাও আমার নয়। চাঁইদের, ওরা গেছে শহরে। আমার পেটে দানা পড়েনি। চাঁইদের সঙ্গেই যেতে হবে বাছুরডোবা। সেখান থেকে বাড়ি। সন্ধ্যা হয়ে যাবে রে। সূর্য ডুববে, তবে তোরা যদি শহরের ঘাট হয়ে যাস তা হলে নাওতে উঠতে পারিস। তাড়াতাড়ি থাকলে অন্য নাওয়ের তালাস কর।

ওরা বলল, কখন নাও পাব তার ঠিক নেই। তোর নাওতেই যাব শহরের ঘাট ঘুরে। তোর বৈঠার সঙ্গে আমরাও হাত মেলাব রে ফরিদ, দেখবি তর্ তর্ করে গাঙ্গ পেরিয়ে যাব।

নৌকা ভাসল শহরের মুখে।

শহরের ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ল তখন ঘাটে চাঁই মেয়েরা ভিড় করেছে। রামু বালির গাদায় বসে এতক্ষণ ফরিদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

নৌকার দড়িটা রামু মোড়লের দিকে ছুড়ে দিতেই রামু শুধালো, কত হল রে ফরিদ?

বার আনা।

মন্দ কি। আজকের মজুরি পুষিয়ে গেছে। এই মেয়েরা, তাড়াতাড়ি উঠে পড়। সূর্য ডোবার আগেই গাঁয়ে ফিরতে হবে। তোর তো পেটে দানা পড়েনি রে ফরিদ। এই নে তিলেখাজা আর মুড়ি। আরে ও শোশে, তুই তো মণ্ডা এনেছিস, দে একটা ফরিদকে। কলসীতে জল আছে তো?

নৌকা যখন বাছুরডোবার ঘাটে ভিড়ল তখন সূর্যপাটে বসেছে। তাড়াতাড়ি নেমে যে যার ঘরের দিকে ছুটল। পেছন ফিরে তাকাবার অবসর ছিল না তাদের। তাদের স্বামী পুত্র কন্যারা তাদের পথের

দিকে তাকিয়ে আছে। কখন ফিরবে তার বউ, কখন ফিরবে তাদের মা, এই তো বড় সমস্যা চরের মানুষের।

দাঁড়িয়ে রইল ফরিদ। দেখছিল ওদের চলার গতি।

কিন্তু শশীবালা যেতে যেতে পিছন ফিরে ফরিদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন রে মিঞা?

ভাবছি কোন দিকে যাব।

আজ জমায়েত নেই?

আছে। যাব না ভাবছি।

যাবি না কেন? তোর কত নাম। আজ গাঁ উজাড় করে তোর গান শুনতে যাবে। তোর তো পেটে দানা পড়েনি, চল আমার ঘর। গরম গরম আলুভত্তা আর ভাত খেয়ে নিবি। গান করতে যাবি না কেন? খেয়ে দেয়ে গতরে জোর করে নে। গোস্‌সা করিস না। খালি পেটে গোস্‌সা বাড়ে। পেটে দানা পড়লে সব ঠাণ্ডা। চল।

তুই কি যাবি জমায়েতে!

যাব তো মনে করেছি। আমার মরদটা নিশ্চয়ই ভাত ফুটিয়ে রেখেছে। খেয়ে দেয়ে সবাই একসঙ্গেই যাব। সারাদিন এত মেহনতের পর তোদের আলকাপ খুবই ভাল লাগে। আয়। খেয়ে যাবি চল।

শশীবালার বাড়িতে দেরি করতে হয়নি। শশীবালার স্বামী হরো মোড়ল ঘরে ছিল না। তার মেয়ে জনাই রান্না করে রেখেছে। ফরিদ হাত মুখ ধুতে ধুতেই হরো মোড়ল এসে গেল। ফরিদকে দেখে একগাল হেসে বলল, কি মনে করে?

তোমার বউ, আমার কাকী, দাওয়াত দিয়েছে হরো কাকা। আজ রাতের দানা পানি তোমার ঘরে।

ভাল, ভাল। ওরে জনাই ফরিদকে জায়গা করে দে। তুই বুঝি আজ আসরে গান করবি? তাই তো, দেরি করিস না।

চোদ্দ-পনের বছরের জনাই বাবার সঙ্গে ক্ষেতে খামারে কাজ করে।

বিকেলবেলায় মাঠ থেকে আনাজ তরকারী উঠিয়ে ঝুড়ি বোঝাই করে। পরের দিন সকালে পান্তা খেয়ে তার মা বের হবে শহরের বাজারে বিক্রি করতে। সন্ধ্যার আগেই রোজ ভাত ফুটিয়ে রাখে, মা ফিরেই যাতে খেতে পায় তার ব্যবস্থা পাকা করে চাটাই পেতে ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে চুপটি করে। নিত্যকার কাজ, কোনদিন এদিক-ওদিক হয় না। সন্ধ্যার আঁধার নামার আগেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে গোয়ালে গরু বেঁধে রাখে। অধীর প্রতীক্ষা করে মায়ের জন্য। আকাশে মেঘ দেখলে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। নদীতে জলের তোড় বাড়ে ঝড় উঠলে, বৃষ্টি হলে জলের মাত্রা বাড়ে। সবটাই ভয়ের। মা ঘরে ফিরলে তবেই শান্তি। মাঝে মাঝে অনুযোগ করে। বলে, তোকে আর যেতে হবে না মা। আমি যাব বাজারে। শশীবালা বোঝে জনাইয়ের মনের কথা, তাকে প্রবোধ দেয়। বুঝিয়ে বাজিয়ে ঘরে রেখেই যায়। শশীবালাও রোজই কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসে শহর থেকে মেয়ের জন্য। কোনদিন চুল বাঁধার ফিতে, কোনদিন সুষুমালতী, কোনদিন রেশমী চুড়ি, কোন কোন দিন মিঠাই মণ্ডা। হরো মোড়লের একটাই সন্তান। দুটো গিয়ে একটা তাই আদর বেশি তার। চাঁই বাড়িতে অত বড় মেয়ে আইবুড়ো থাকে না। ব্যতিক্রম শুধু জনাইয়ের বেলায়। হরো মোড়লকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস না কেন ? উত্তর দেয় না হরো মোড়ল, শুধু হাসে।

হাসার কারণ জানতে চাইলে বলে, ভাল পাত্তর পাই না।

জনার্দন ঠাকুরকে মানত করে মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে হরো মোড়ল, তাই নাম রেখেছে জনাই। জনাই ছোটবেলা থেকেই বাপের কোল চেপে মাঠে গেছে, জমির আইলে মেয়েকে বসিয়ে হরো মোড়ল কোদাল মারত জমিতে, বীজ বসাতো, আনাজ ক্ষেতে সেচ দিত। দুপুরে রোদ তেতে উঠলেই চিন্তা করত হরো মোড়ল ঘরে ফেরার। হাত ধরে ফিরে আসে ঘরে, সোতায় স্নান করে উনুন ধরায়, ভাত তুলে দেয়। মেয়েকে খাইয়ে বসে থাকে শশীবালার জন্য। আট বছরের জনাই বাবাকে সাহায্য করত, মাঝে মাঝে পাকা গিন্নীর মত রাঁধতেও

বসত। এই ভাবেই ধীরে ধীরে সংসারের ভার সে তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে। আদরে আহ্লাদে বড় হয়েছে জনাই। অন্য চাষীদের চেয়ে তার দায় কম, তাই অবস্থাও সচ্ছল। ছোটবেলা থেকে চাঁই মোড়লদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি শিখে জনাই এখন একটা পরিপক্ক মহিলা। কোনদিন কোন কাজে গাফিলতি করে না, কোন দিন কোন কাজ পরে করব বলে রেখে দেয়নি, পাড়ায় কারও সঙ্গে কখনও কলহ কাজিয়া করেনি। তবে বাড়ন্ত তার দেহ। চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ে মনে করত সবাই। শুধু তার কচি মুখখানা জানিয়ে দেয় তার বয়সের গণ্ডী কত। পাড়ার অন্য সব চাঁই মেয়েদের মত তার আচার আচরণ নয়। অনেক সময় মুখরা হলেও ঝগড়ায় পটু নয়। কেউ কোন বেফাঁস কথা বললে আর রক্ষা নেই। কোন অসৎ ইঙ্গিত করলে হাতের কাছে লাঠিসোঁটা যা পেয়েছে তাই দিয়ে তাকে কঠিন শিক্ষা দিতে একটুও ভুল করেনি কখনও। কখনও কাউকে অশালীন গালি-গালাজ করেনি।

জনাইয়ের বয়সী মেয়েরা ঘর সংসাব কবছে। তারাই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে। জিজ্ঞেস করে, তোর বাবা তোর বিয়ে বুঝি দেবে না জনু?

জনাই চোখ পাকিয়ে বলে, নাই বা দিল। তোরা তো ভাতার পেয়েছিস। ওতেই আমার সুখ। আমার কথা তোদের ভাবতে হবে না আমার ভাতারের দরকার নেই।

কুলহার নদীর চরে ফনাই মোড়লের ঘর। এসেছিল বাছুরডোবায় কুটুমবাড়ি। জনাইকে দেখেই তার পছন্দ হয়েছে। হরো মোড়লকে ডেকে বলেছিল, তোর মেয়ে তো ডাগর হয়েছে রে হরো। আমার ব্যাটার সঙ্গে তোর বিটির বিয়ে দিবি? সুখেই থাকবে।

হরো মোড়লের খুব আপত্তি ছিল না। হরো মোড়লের ভয় জনাইকে। হঠাৎ কথা দিতে পারল না। বলল, আমার বউকে শুধিয়ে তোকে খবর দেব। তবে বিটির কথা বিটিকেও শুধোতে হবে।

জনাই তার মাকে খুবই ভালবাসে। শশীবালার চোখের মণি। চাঁই বাড়ির উপযোগী করেই জনাইকে বড় করে তুলেছে।

হরো মোড়লও চায় তার মেয়ের-কপালে যেন থাকে সুখের ঘর।' তবে জনাই মুখরা। তাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু করা উচিত নয় সেটাও বোঝে। বিয়ের কথা পাকা করলে হয়ত তেড়ে আসবে কাটারি নিয়ে। শেষে পুলিসের হাঙ্গামাও হতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল, আগে শশীবালাকে রাজি করাতে পারলে, জনাইকে রাজি করাবে শশীবালা। কিন্তু সাহস করে কথাটা উত্থাপন করতে পারছিল না হরো মোড়ল।

ফনাই মণ্ডল ঠিক বুঝতে পারেনি হরো মোড়লকে। যদি বুঝতে পারত তা হলে খুশি মনেই ফিরে যেত নিজের ঘরে। কিন্তু হরো মোড়লকে না বুঝেই ব্যাজার হয়ে ফিরে গেল।

মাঝে মাঝে হরো মোড়ল জনাইকে বিয়ের কথা বললে জনাই হাসে। হরো মোড়ল বলে, আখেরে তোর কপালে কষ্ট আছে জনাই।

তবুও জনাই হাসে। বাপের কথায় রাগ করে না। বাপের সেবা করে, জমিতে কাজ করে, ঘর সংসার সামলায়। বিয়ের কথায় বলে, আমার কপাল তো তুই রুখতে পারবি না বাবা, আমার কপাল আমারই থাকবে।

ফরিদকে সঙ্গে করে শশীবালা এসে দেখল জনাই কাঁথা সেলাই করছে। হরো মোড়লের গলার শব্দ পেয়ে চাটাই হাতে এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল।

হরো মোড়লকে লক্ষ্য করে ফরিদ বলল, আমি আর বসব না কাকা। রাতে আলকাপের জমায়েতে এস, ভাল পালা আছে আজ। আমি যাচ্ছি। তোমরা পরে এস, কেমন ?

বাইরে শশীবালার গলা শোনা গেল।

তোর খাওয়া হয়েছে রে ফরিদ ?

ফরিদ বলল, ঘরে গিয়ে খাব কাকী।

শশীবালা সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, তোর সৎমা খুব যত্ন করে ?

তা করে।

জনাই তখনও চাটাই হাতে করে দাঁড়িয়েছিল। চাটাইটা মাটিতে নামিয়ে বলল, তা হলে তোর আর খেতে হবে না। তোর সৎমার আবার গোস্সা হবে। আর আমাদের ঘরে আছেই বা কি!

জনাইয়ের কথা শুনে শশীবালা খেঁকিয়ে উঠল, আমি ওকে ডেকে এনেছি। তুই ওকে ভাগাতে চাস? আমার ঘরে দুটো ভাত বুঝি নাই? তোর সাহস তো কম নয়।

জনাই লজ্জিত হল না। রাগও করল না। হেসে বলল, আমার ঘরে তো সৎমা নাই। সৎমায়ের মত যত্ন কি তুই করতে পারবি মা। ওর সৎমা ভাতের থালা নিয়ে বসে আছে। আমাদেরই যত গরজ দেখছি।

ঠাট্টা বুঝতে পেরে ফাঁপড়ে পড়ল ফরিদ। মৃদুস্বরে বলল, আবার তো তোকে ভাত ফুটাতে হবে।

গেরস্ত বাড়িতে অতিথি এলে ভাল করে খেতে দিতে হয় তা বুঝি জানিস না। সকালের পান্তা থাকে চাষীর বাড়িতে। এটাও জানিস না। খাবি তো বস্।

তার চেয়ে এক গেলাস পানী আর গুড় দে। সন্ধ্যার আগে না পৌছালে আলকাপের জমায়েত আর হবে না।

শশীবালা বলল, তাই দে। বুঁট ভেজানো আছে। আজ মণ্ডা এনেছি তাও দে।

ভেজা ছোলা চিবুতে চিবুতে ফরিদ বলল, তোদের জমির বুঁট বুঝি!

হরো মোড়ল ক্ষোভের সঙ্গে বলল, গত সনে বুঁটের আবাদ করতে পারিনি। এবার কিছুটা পেয়েছি। সকাল বিকেলের নাস্তার কাজ চলে যাবে। গত সনে শংকরের কাছ থেকে কয়েক সের বুঁট কিনেছিলাম, তারও কিছুটা আছে। চলে যাবে এ বছরটা। কিছুটা বীজও রেখেছি আগামী সনের জন্য।

খাওয়া শেষ করে নীরবে বেরিয়ে গেল ফরিদ।

বাড়িতে যখন পৌছাল তখন আবছা আঁধারে আকাশের বুকে

চাঁদ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। হন্‌হন্‌ করে বাড়ি পৌছে গেলেও খেতে বেশ বিলম্ব হল। ফেলানিবিবি অনেক যত্নে তাকে বসিয়ে খাবার ব্যবস্থা করল। খেয়ে দেয়েই ফরিদ ছুটল জমায়েতের দিকে।

পেছন থেকে কে যেন ডাকল, ও ফরিদ মিঞা, দাঁড়াও।

ফরিদ দাঁড়িয়ে গেল। চাঁদের আলোতে দেখতে পেল একটা মেয়েকে। কিছুটা এগিয়ে এসে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, তোর গোস্‌সা হয়েছে ফরিদ?

এবার ফরিদ স্পষ্ট দেখতে পেল জনাইকে।

মুখ ঘুরিয়ে হন্‌হন করে চলতে চলতে ফরিদ বলল, তাতে তোব কি?

আমার তো কচু, তোর খাওয়াটা হল না তাই বলছিলাম।

ফরিদ যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে বলল, তুই তো আলকাপ শুনতে যাচ্ছিস, পেছন পেছন আয় আমার দেরি হলে চলবে না।

যা না তুই। আমি কী তোরে বেঁধে বেখেছি। তোর গান শুনতেই তো যাচ্ছি। দেখব, আজ কেমন তোর গানের হিম্মত।

ফরিদ জবাব না দিয়ে এগোতে থাকে।

পেছন থেকে শুধুমাত্র জনাইয়ের হাসির শব্দ তার কানে ভেসে আসে।

চাঁইপাড়ার মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে পেছন পেছন কলরব করতে করতে আসছিল। জনাই তাদেব সঙ্গে মিশে গেল।

ফরিদ পৌছানোর আগেই হাসিম তার দলবল নিয়ে আসর সাজাতে আরম্ভ করেছিল। ফরিদকে দেখেই ওরা উৎসাহিত ভাবে বলল, বাঁচা গেল। তোর বাড়িতে সারাদিন লোক পাঠিয়েও কোন হদিস করতে পারিনি। আমরা মনে করেছিলাম তুই আর আসবি না। ছোলেমানের বিটি তোব হদিস করতে গিয়েছিল তোর বাপের কাছে। আমাদের দেখেই বলল, আজ ফরিদ গান করবে না? বললাম খোদা মালুম, ফরিদ তো গাঁয়ে নেই। দেখি সে আসে

যদি! ছোলেমানের বিটি বলল, আহা। অমন গান আর শুনিনি কখনও। আজও সে আসবে রে ফরিদ।

ফরিদ মুখ ঘুরিয়ে বলল, শুধু আমার কথাই বলল, তোর কথা বলেনি বুঝি।

হাসিম হেসে বলল, তোর নসীব আর আমার তগ্দীর।

তদ্বির না করলে তগ্দীর খোলে না রে হাসিম। ছোলেমানের বিটির নেক নজর হাসিম মিঞার ওপর, জানিস তো। এবার তুই সামলাবি।

হাসিম হাসল। বলল, তা হবে। দেখি যদি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়। তা হলে আমার বদ নসীবও চকচকে হতে পারে। ওরে ও মুরু। আঁধার নেমেছে মশালগুলো জ্বেলে দে। লণ্ঠনগুলো জ্বেলে ঝুলিয়ে দে। শোন ফরিদ, বিটি ছাওয়ালের নেক নজরকে বিশ্বাস করিস না। তোর হাসিনা কি ঘর করল? খাঁচায় ফুটো পেলেই ফুরুৎ, উড়া পাখি উড়ে যায়।

ফরিদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পেটে দানা দিতে না পারলে খাঁচার পাখিও পালায়, কোন বিটি ছাওয়াল ঘর করে না হাসিম। হাসিনার কোন কসুর নেই, কসুর আমার। গান শুনলে তো পেট ভরে না। তাই বিনা তালাকে খবিরের ঘরে গিয়ে উঠেছে।

হাসিম গম্ভীরভাবে বলল, ওসব মেয়ে হাটতলায় ঘর বাঁধে।

আরও কিছু বলার ছিল হাসিমের কিন্তু ফরিদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। হাসিম অনুভব করল কোন দুর্বল স্থানে সে আঘাত দিয়েছে, ফরিদ যে খুবই ভালবাসত হাসিনাকে তা বুঝতে পেরে থমকে গেল হাসিম।

ফরিদ ক্ষোভের সঙ্গে বলল, চাঁইপাড়ার মেয়েরা কি বলে জানিস?

ওরা আবার কি বলে। হাসিনা তো ওদের ঘরের মেয়ে নয়।

হাসিনার কথা বলে না। বলে, তোরা সকালে নিকে করে বিকেলে তালাক দিস। তোদের ঘরের মেয়েরাও তাই ফাঁক পেলেই পালিয়ে যায়।

মিছা কথা।

তা বটে। ওরা সত্যি সত্যি মানুষের মনের কথা বিচার করে না রে হাসিম। সেদিন শহরে সাত্তার হাজি বলছিল, কতকগুলো শয়তান লোক ইসলামের নামে অনাচার করে তাই অন্যরা আমাদের ছোট মনে করে। মন ও প্রাণ এটা নিয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। নিকা কর, তালাক দাও, এটা তো ধর্ম নয়, ধর্ম হল আলাদা বস্তু। রসুলের হুকুম মেনে চললে এসব কথা শুনতে হত না।

হাসিম কথা না বলে বালির ওপর মোটা করে পোয়াল বিছিয়ে জমায়েতকে পাকাপোক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফরিদ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে গোপনে চোখ মুছল। হাসিনাকে হারাবার ব্যথা সে ভুলতে পারেনি।

ফরিদ বলল, আমিও ঘর থেকে ঘুরে আসি। তোরা সব জোগাড় কর।

ফরিদ রওনা হতেই তার পথের দিকে তাকিয়ে হাসিম ভাবছিল হাসিনার কথা। ফরিদকে সবাই মানা করেছিল, হাসিনাকে নিয়ে শহরে যাস না ফরিদ। কিন্তু কারও কথা শোনেনি ফরিদ। শহরের জলুষে হাসিনার মতি গেল বদলে। আরও দাও, আরও চাই এই চিন্তা হাসিনার মনে কিল বিল করতে থাকে। তার চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা ছিল না ফরিদের। ক মাস না পেরোতেই সংসার ভাল করে সাজাবার আগেই সব কিছু বেঠিক করে দিল হাসিনা। লোকে বলে মন না মতি। হাসিনার মন আর মতি গতি হারিয়ে পর্দার বিবি হবার বাসনা নিয়ে খবিরের ঘরে গেছে। তার কি কসুর! কারও কসুর নয়। কসুর ফরিদের, না তাও নয়। কসুর ফরিদের দারিদ্রের। গরীব কি ঘর বাঁধতে পারে, সুখের সংসার গড়ার অধিকার তো গরীবের নেই।

হাসিনা ফিরে আসবে এমন আশা কেউ করে না, তার ফেরার পথও বন্ধ। ফরিদের মনের কথা কেউ জানে না, জানে একমাত্র খোদাতালা। চরের মানুষ হাসিনা ফরিদকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। এতো হামেশাই হয় গরীবের ঘরে। বিয়ে-তালাক-নিকে

মহরানা পারিবারিক ব্যাপার। এর ওপর কারও হাত নেই। ফরিদ এটা মেনেই নিয়েছে। হাসিনাকে ফুসলে নিয়ে গেলেও ফরিদ থানা-পুলিস-আদালত করেনি। ফরিদ জানে খবিরের পয়সা আছে, সে পয়সা দিয়ে মেয়ে মানুষ কিনতে পারে। হাসিনা যে তালাকী বিবি তা প্রমাণ করতে একশজন সাক্ষী হাজির করতে পারে। তাতে ফরিদ বউ পাবে না, যদিও পায় তা হলে পাবে না হাসিনার ভালবাসা। কেমন যেন জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে হাসিনা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই কিল খেয়ে কিল হজম করা ভিন্ন আর পথ খোলা ছিল না ফরিদের সামনে।

আজকের আসরে ফরিদ প্রাণ দিয়ে গানও করতে পারেনি, নাচের তালও বার বার কেটেছে। অবশ্য শ্রোতারা ঠিক বুঝতে পারেনি এই ভঙ্গকে, তারা তারিফ করে ঘরেই ফিরে গেছে।

সে রাতের পর অনেকদিন আলকাপের জমায়েত আর হয়নি। ফরিদকে ডাকলে সে কেমন এড়িয়ে চলেছে, কোন সময়ই আগ্রহ দেখায়নি।

হাসিম এসে বলল, বায়না আছে ফরিদ।

কিসের বায়না?

ঘোড়ামারার চরে তিন রাতের আলকাপী জমায়েতের দাওয়াত, যাবি তো?

ভেবে বলব। শরীরটা ভাল নেই রে হাসিম।

হাসিম ঠাট্টা করে বলল, আসলে তোর মন চায় না। তুই না গেলে ওরা গালিগালাজ করবে।

ফরিদ বলল, তা কেন করবে। যে দেশে ফরিদ নেই সে দেশে কি আলকাপের জমায়েত হয় না। আমার বদলা কাউকে খুঁজে নে।

এদিকে নৈমুদ্দির ঠাণ্ডা লেগে গলা নষ্ট হয়েছে। লখা তাকে বলেছে জেলেপাড়ার দয়াল হালদারের বাড়িতে শিবানীপুর থেকে একজন কুটুম এসেছে, লখারও কুটুম বটে। তার গানের গলা ভাল, শিখিয়ে নিলে ভালই নাচগান করতে পারবে। হাসিম লখাকে

নিয়ে গেল দয়ালের বাড়িতে। নতুন কুটুম অবিনাশ তখন চাটাইতে শুয়ে বিড়ি টানছিল, হাসিমকে দেখিয়ে লখা বলল, এই আমাদের কুটুম ওবেমাঝি। এর কথাই বলছিলাম, এবার তুমি কথা বলে দেখ।

অবিনাশ উঠে বসে হাসিমকে চাটাইতে বসতে বলল।

তারপর কি কথা আছে মিঞা ?

অবিনাশের প্রশ্নটা খাপ ছাড়া হলেও হাসিম দমে গেল না। বলল, আমাদের এখানে আলকাপের দল আছে, তা বোধহয় শুনেছ, পাঁচটা গ্রামে নাম ডাকও আছে।

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলল, শুনেছি।

আমাদের মূল গায়েন ফরিদ বড়ই কাহিল, দেহটা তার ভাল যাচ্ছে না। লখা বলছিল, তোমার গলা আছে, তাই এলাম। ফরিদের বদলে তোমার যদি সময় হয় তা হলে ঘোড়ামারার চরে তিনদিন আলকাপের আসর বসাতে পারি।

অবিনাশ অবাক হয়ে হাসিমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি ভাবছ মাঝির পো ?

আমি তো আলকাপী গান জানি না! আমি কি পারব ?

লখা বলল, হবে হবে, পারবে তুমি। তোমাকে আমরা শিখিয়ে নেব। দুদিন মহরা দিলেই রপ্ত করতে পারবে ওবেদা। তোমার গলা ভাল, আমাদের হাসিমভাই ভাল মাস্টার। দেখবে তুমি আসর জমিয়ে দিতে পারবে।

অবিনাশ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, একদিনে তো হবে না লখাভাই। শিখতে সময় দরকার। সবই তো আমার কাছে নতুন।

বেশ আজ বিকেলে মহরা বসবে, তুমি একবার দেখে নিও।

সেদিন অবিনাশ আলকাপের মহরা দেখল ও শুনল।

পরের দিন ফরিদের বদলা অবিনাশ নামল মহরায়। এই মহরা চলল পরপর কয়েকদিন। অবিনাশ দোতারা বাজিয়ে, নূপুর পায়ে নেচে নেচে গান করে মাতিয়ে তুলল মহরার জমায়েত।

লখা দেখে শুনে বলল, কেমন পারলে তো!

অবিনাশ হেসে বলল, ময়দানে কেমন হবে তা তো জানি না, দেখি কি হয়।

সবাই মিলে গেল ঘোড়ামারার চরে। তিনদিনের দাওয়াত।

অবিনাশকে পেয়ে হোগলবাড়িয়ার আলকাপীর দল প্রায় ভুলেই গেল ফরিদকে।

ফরিদ সকালবেলায় পান্তা খেয়ে চরের কিনারে কিনারে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যার আগে ফিরে আসে বাড়িতে। আজকাল গ্রামের কারও সঙ্গে মেলামেশাও করে না। কেমন উদাস উদাস ভাব। ফেলানিবিবি ছেলের মতিগতি দেখে বেশ চিন্তিত। মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করে, তোর মতলব তো বুঝতে পারছি না রে ফরিদ।

মতলব, বলেই ফরিদ থেমে যায়। আবার বলে, মতলব আর কিছু নেই।

ফেলানি এতে শান্ত হতে পারেনি। এনায়েত ফকিরকে ডেকে বলল, ছাওয়ালের বিয়ে-নিকের ব্যবস্থা কর মিঞা। ছাওয়াল যে বিবাগী হতে চলেছে। শেষে ফকিরি নিয়ে বাপের নাম রক্ষা করবে কিন্তু ভাল হবে না। শীগ্‌গীর কিছু ব্যবস্থা কর।

এনায়েত মুরুব্বী চালে বলল, তোরই দেখছি বেশি ভাবনা। তোর পেটের ছেলে তো নয়। তুই তো বাঁজা। পরের ছেলের মা হয়ে তুই যে পাগল হতে চাস।

ফেলানিবিবির মনের অতি গোপন স্থানে এনায়েতের কথাগুলো কঠিনভাবে আঘাত করল। কথাটা সত্য হলেও আঘাতটা অসহ্য। যে কোন মেয়েই এসব শুনলে লজ্জায় আর দুঃখে আত্মহারা হয়ে থাকে। ফেলানি অনেকক্ষণ এনায়েতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে গোয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। সকালবেলায় গরুগুলো ছেড়ে না দিলে সারাদিন মাঠ চরে খেতে পারবে না। ফেলানিবিবি সন্তান পায়নি কিন্তু মায়ের মত মনটা তার শুকিয়ে যায়নি। যে মমতা দিয়ে ফরিদকে বড় করেছে, সেই মমতার এক কণিকাও জমা থাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে। দশ বিশ বছর ঘর করেও যারা

স্বামীর সামান্যতম মমতার আশ্রয় পায় না, তারাও সন্তানকে মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত করে না। নারীত্ব লাঞ্ছিত হলেও, মাতৃত্ব কখনও নিষ্ঠুর হয় না। বন্ধ্যা নারী যখন অপরের সন্তানকে মায়া মমতা দিয়ে বুকে আশ্রয় দেয় তখন চিন্তা করে না, এ সন্তান কার! নিজের হোক অপরের হোক সন্তানের স্থান থাকে নারী মনের মাতৃত্ববোধের মনিকোঠায়। ফরিদকে সে আশ্রয় দিয়েছে তার বুকে। স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে দিয়েও সে তার মা হতে পারেনি, এটাই বিচিত্র। এতে আছে শুধু অবিশ্বাস। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কারণ সেও তালাকি বিবি। সে চেয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়। আশ্রয়ের আশায় নিকা করেছে। তার স্নেহের আশ্রয়ে স্থান পেয়েছে ফরিদ কিন্তু তার মাতৃত্ববোধকে বিশ্বাস করেনি এনায়েত। সম্পদ তার দেহটা। যৌবনের সব রস নিংড়ে নিয়ে তালাক দেবার কারণটা যে মানবতাবিরোধী এই সত্যটা অসহায় তালাকি বিবি হাড়ে হাড়ে বোঝে। কিন্তু ধর্মের ঠিকাদার সবাই হল পুরুষ। পুরুষের অনুশাসনে অসহায় তালাকি মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হয় নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধ পৃথিবীর মুক্ত আঙ্গিনায়, তারা ছোটে নতুন আশ্রয় সন্ধানে। তারা যা পায় সেটা তো আশ্রয়, তার বিনিময়ে তাকে উজাড় করে দিতে হয় দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও। প্রেম, ভালবাসা, মায়া, মমতা এসব তো কেতাবী কথা। দেহ সম্পদকে একজনের ভোগ্য করে অপরিতৃপ্তি নিয়ে অপরের অঙ্কশায়িনী হওয়া কত বড় মর্মান্তিক ও মানবতাবিরোধী এবং নারীত্বের অপমান সে কথা বুঝিয়ে বললেও পুরুষ প্রধান সমাজ তা স্বীকার করে না। একেবারে বিগতা যৌবনা নয় বলেই এনায়েতের আশ্রয় পেয়েছে, পেয়েছে ছোট একটা সংসার আর একটি শিশু যে তাকে মা বলে ডাকে। এই রকম নিকা কতটা সত্যকার নিকা তা তর্কাতীত নয়। কিন্তু নারীর পক্ষে একটা আশ্রয় মাত্র। আর্থিক নিরাপত্তার অভাবই বোধহয় বিবাহে অনিচ্ছুক তালাকি বিবিকে আবার বিয়ের কথা ভাবতে হয়। নীরবে সহ্য করে নারীত্বের অবমাননাকর এই অলিখিত অত্যাচারের অধিকার।

ফেলানিবিবি গরুগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসে গোয়াল থেকে গোবর কুড়িয়ে জড় করল। মাটির কলসী কাঁখালে নিয়ে গেল সোঁতায় জল আনতে। নিত্যকার কাজ। এনায়েত তখন সুতো নিয়ে খেপ্ জাল বুনতে বসে। চাষের সময় এনায়েত সকালবেলায় মাঠে যায়। কোন কাজ না থাকলে কোন কোন দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করতে। কোন কোন সময় ক্ষেপ জালে মাছ ধরতে যায় এনায়েত। ফেলানিবিবি ধান সেদ্ধ করে, ধান শুকোয়, উদুখলু ধান ছকায়। মুখে কথাটি বলে না কোন সময়ই। নীরবে সংসারের সব কাজ করে ফেলানিবিবি। চরের মানুষ কাজ করে প্রশংসার প্রত্যাশায় নয়, করার দায়িত্ব পালন করতে।

ফেলানিবিবি বেরিয়ে যেতেই এনায়েত গামছা মাথায় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। চাষের মরশুম শেষ। এখন চাষীর বিশ্রাম। চরের তিনটি গ্রামের পাঁচ-ছয়'শ বাসিন্দার কয়েক ঘর জেলে আর চাঁই মোড়লদের কাজ সারা বছর ধরে। চাঁইপাড়ার কয়েকটি উঠতি বয়সের মেয়ে আর শিশু ছাড়া কেউ থাকে না পাড়ায়। পুরুষরা যায় মাঠে, বয়স্ক মেয়েরা যায় শহরে আনাজের ঝুড়ি মাথায় করে। জেলে পাড়ার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব পুরুষই যায় নদীতে আর সোঁতায় মাছ ধরতে। মেয়েরা পোলই আর খেপ জাল নিয়ে খানাখন্দে ঘোরে নিজের ঘরের উপযোগী মাছ সংগ্রহ করতে। গ্রামে সারা বছর যারা থাকে তাদের অধিকাংশই মুসলমান। রাতের বেলায় চরের চেহারা বদল হয়। সবাই তখন নিজের নিজের ঘরে, কুপি জ্বালিয়ে অনেকের ঘরে রাতের খাওয়া মেটায়। খাওয়া শেষ করে চাটাই পেতে বসে, গল্পগুজব করে, নইলে তারা দেয় টানা ঘুম। কারও ঘরের দরমার ফাঁক দিয়ে কুপির আলো দেখা যায় অনেক দূরেও। জেলেদের নৌকার গলুইতে লণ্ঠন জ্বলে, সেই আলো ছোট ছোট ঢেউয়ের বুকে আলোর ঝিলিক দেয়। মাঝে মাঝে শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসে বাতাসে। দু-একটা দেশী কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দও শোনা যায়। চরে জীবজন্তুর সংখ্যা খুবই কম, গরু-ছাগল কিনা কেউ কেউ শহর থেকে দেশী কুকুরের

বাচ্চা এনে পুষেছে চরকে সরগরম করে রাখতে। ওরাই গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সজাগ করে দেয় চরের মানুষদের।

এনায়েত ফকির সেদিন শহরে গিয়েছিল। শহর থেকে ফেলানি-বিবির জন্য নক্সা পাড় শাড়ি আর নিজের জন্য ডোরাকাটা চেক লুঙ্গি নিয়ে সোজা গিয়েছিল হাসিমের বাবা আল্লারাখার কাছে।

শহরে গিয়েছিলে বুঝি ?—জানতে চাইল আল্লারাখা।

হাঁ ভাই। বিবির তাগিদে যেতেই হল। গেলাম বলেই সমাচারটাও শুনলাম।

কি শুনে এলে ?

আবার লড়াই আরম্ভ হয়েছে। লড়াই হচ্ছে বিলেতে। আমাদের অংরেজ বাদশার সঙ্গে জারমানীর লড়াই। সেই যে একবার আমাদের ছোটবেলায় শুনেছিলাম লড়াই হয়েছিল, আবার সেই লড়াই হচ্ছে।

এনায়েত ফকির দম নিয়ে আবার বলল, আল্লার কুদরত রে ভাই। দেখ এবার কি হয়। আরে রাজায় রাজায় লড়াই হয় আর আমাদের মত গরীব-গুরোবদের জানমান যায়। আমাদের ফইম মিঞা হজ্জ করে এসেছে। তার কথাই শুনছিলাম। উঃ। আল্লার রহম না থাকলে কি আর হজ্জ করা যায়। আমার হাতে আবে জমজমের পানি দিয়ে বলল, মিঞা হজ্জে যাওয়ার নসীব তো সবার হয় না, তাই গরীব মিচকিনদের জন্য জমজমের পানি এনেছি। কাবার পানি। বুঝলে মিঞা। এসব বলেই বলল, তোমাদের চরের গাঁয়ে যাব। আমার সঙ্গে যাবে পোড়াঘাটির পীর ছামছুল সাব্। ফইম হাজি আরও বলল, তোমরা হলে না-পাক্। চরের মিঞারা পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে না। ঠিকমত রোজাও করে না। তোমরা দোজকের সামিল হবে।

এই সব বলল !

হ্যাঁরে ভাই হ্যাঁ। আমরা হলাম গিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি। আমাদের ভরসা করেই আসবে। পীরসাহেব তশরীফ্ রাখবে আমাদের মুসলমানীর এলেম দিতে।

আমাদের ওরা মুসলমান মনে করে না? বলিস কি!

হাঁরে হ্যাঁ। আমাদের অনেক কাজ। তিনটে গাঁয়ের মানুষকে জড় করতে হবে। পাশের ঘোড়ামারার চরেও খবর দিতে হবে।

আল্লারাখা বেশ চিন্তিত হল। তার মনে হল এত দিনের ধারাবাহিক জীবনধারায় যে পরিবর্তন আসবে তাতে কতটা ভাল হবে, কতটা মন্দ হবে সেটাই স্থির হবে ভবিষ্যতে।

পরের দিনই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল তিনটি গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে বাইরের চরেও। এানয়েতই উদ্যোগী হয়ে সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল। মুরুব্বীরা পীরের আর হাজীর অভ্যর্থনায় নেমে পড়ল। আল্লারাখা ঠিক মেনে নিতে পারেনি এই উদ্যোগ আয়োজনকে।

আমাদের এখানে একটা মসজিদ নেই। পীরসাব যখন শুনবে এত বড় মানুষগুলোর আবাদীতে একটা মসজিদ নেই তখন ভয়ঙ্কর গোস্‌সা হবে। নমাজও পড়তে হলে, কিন্তু নমাজ জানা লোক একটাও বোধহয় চরে নেই। আল্লার বাণী কোরাণের আয়েত জানা লোকও নেই একজনও। যারা নমাজ পড়তে জানে বলে দাব করে তারা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে কিনা সন্দেহ। নানা সমস্যায় জর্জরিত চরের মানুষ আল্লার নাম নেয়, দোহাই দেয়। যাদের জীবন শুধু বাঁচার লড়াইতে শেষ হয়ে যায় তারা কোন সময়ই ধর্মের অনুশাসনগুলো শোনার ও জানার অবসরই পায় না। মেনে চলা তো দূরের কথা। নিপুণভাবে পালন করার সময় তাদের কখনও ছিল না, এখনও নেই।

খবরটা ফরিদও শুনেছে। ফেলানিবিবিকে ডেকে বলল, শুনেছিস মা, পোড়ামাটির পীরসাহেব আসবে আমাদের চরে।

শুনেছি। পীরবাবা যা তা লোক নয়। খোদার আসল বান্দা। বেহেস্তের ডহর চেনে।

ফেলানিবিবি হাসতে হাসতে বলল, ঠিক বলেছিস বেটা। এই জনমে ভাত কাপড় জুটল না, কবরে দেহ রাখলে বেহেস্তের সুখ পাব, একি কম কথা। হায় খোদার বিচার!

বিচার! হাঁ! বিচারই বটে শহরের মুসলমানরা আমাকে বলত, তোরা মুসলমান নোস্। তোরা বে-ছোয়াবি আলকাপী নাচ গান করিস। সরা শরীয়ত হাদিস মানিস না, নমাজ পড়িস না, দোজকেও তোদের ঠাঁই হবে না। আমি বলতাম, আলকাপে আল্লার নামই তো করি, আলকাপ তো খারাপ নয়। খাবিরুদ্দি নিশ্চয়ই খাঁটি মুসলমান। শারীয়ত কি ওকে বলেছ অন্যের বিবিকে ফুসলে নে। জানিস না, যারা এমন কাম করে তার শাস্তি হল মরণ। কই খবিরকে কেউ তো শাস্তি দিতে এগিয়ে আসেনি। ওদের চেয়ে অনেক ভাল মুসলমান আমরা। দিন রাত আল্লার নাম করি, কারও কোন ক্ষতি করি না, কারও বিবি নিয়ে টানাটানিও করি না। আর দোজকে আর বেহেস্ত বিনা আর তো আল্লার রাজ্যে কিছু নেই, যদি দোজকে স্থান না হয় তা হলে বেহেস্তের দরজায় তো পড়ে থাকতে পারব। আর কবরে যেদিন যাব তারপরে তো আর কিছু নাই। ওখানে শ্যাস্, এর বেশি চাই না।

ফেলানিবিবি ওসব গুরুতর বিষয় বোঝেও না, শুনতেও চায় না। শুধু তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। মৃদুস্বরে বলল, গরীবের কেউ নেই রে বেটা, শুধু ভরসা খোদাতালা।

ফরিদ বের হবার উপক্রম করতেই ফেলানিবিবি তাকে ডেকে বলল, তাড়াতাড়ি আসিস বাপ। সাঁঝের আগেই গরম গরম ভাত আর ছালুন রসোই করে রাখব।

হাঁ, বলেই ফরিদ বেরিয়ে গেল।

চরের ধারে আসতেই দেখতে পেল জনাইকে। মাটির কলসী কাঁখালে নিয়ে সোঁতায় যাচ্ছে জল আনতে।

ফরিদকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল. ফরিদ তার পাশে এসে বলল, পানি আনতে যাচ্ছিস বুঝি!

জনাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল, মুখে কোন শব্দ করল না।

হরোকাকা কোথায়?

মাঠে।

ফরিদ বলার মত কিছু না পেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, শুনেছিস জনাই, লড়াই আরম্ভ হয়েছে।

লড়াই? কিসের লড়াই রে ফরিদ?

এখনও সব শুনিনি। সবাই বলছে অংরেজ বাদশার সঙ্গে জারমানীর বাদশার লড়াই হচ্ছে।

অবাক হয়ে গেল জনাই। বলল, কোথায় লড়াই। সেবার সেই ঘোড়ামারার চরে লড়াই হয়েছিল শুনেছি। এবার কোন চরে লড়াই? চরদখলের লড়াই তো বাপু ভাল নয়। খুন খারাবিও হয়। ও সব ভাল নয়। তুই যাস না যেন। লড়াই করে আমাদের কি লাভ!

তাই তো ভাবছি। ভাবছি লড়াইটা কোথায়! এতো চরের লড়াই নয়। বন্দুক কামান নিয়ে লড়াই। ভাবছি লড়াই দেখতে যাব এবার।

তোর সৎমা যেতে দেবে তো? তোকে বেশি দিন না দেখলে প্রহরে প্রহরে ভিরমি যাবে তোর ফেলানি-মা।

আমি ঠাট্টা করছি না রে জনাই। আর ভাল লাগছে না। কোথাও যাব। কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম, লড়াই দেখতে যাব।

জনাই হেসে বলল, লড়াই করতে তো যাবি না?

তাও যেতে পারি। একটা গুলিতেই শেষ, জানটা লড়াইতেই দিয়ে আসব.

কার তরে জান দিবি রে বেকুব?

তা জানি না। মরতে তো হবেই, চাট্টি পেট ভর্তি খেয়েই মরব। শুকিয়ে মরব না।

উদ্বিগ্নভাবে জনাই বলল, তুই মরতে যাবি! কেন? যাস না ফরিদ। তোদের আলকাপ বন্ধ হয়ে যাবে। গাঁয়ের মানুষ কানা হয়ে যাবে।

ক্ষোভের সঙ্গে ফরিদ বলল, আলকাপ আর করব না রে জনাই।

আর ভাল লাগে না। পেটে ভাত না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না। তাই ভাবছি। শুনলাম সরকার সিপাই নেবে। সিপাইয়ের চাকরি নিলে পেটের ভাত তো জুটবে, আবার নগদ কড়িও ঘরে আসবে।

জনাই হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল. চরের মানুষই সব নয়, শহরের মানুষ আসে তোর আলকাপী গান শুনতে। তুই না থাকলে আমাদের চরের কথা কেউ মনেও রাখবে না।

ফরিদ বাধা দিয়ে বলল, তুই তোর কাজে যা।

তুই না বললেও যাব। তোর কাছে লড়াইয়ের খবর শুনলাম। আমার স্বর্গে যাওয়ার পথ খোলসা হল। লড়াইয়ের খবরে তোর পেট ভরলেও এই গাঁয়ের গরীবদের পেট ভরবে না রে ফরিদ। আমি বলছি তুই লড়াইয়ে যাসনে।

ফরিদ হেসে বলল, আমাদের রমজান মিঞা বলে, আয়াত আর মৌত আল্লার হাতে। তুই বললেই আল্লা মিঞা আমাকে মাপ করে বেহেস্তের রাস্তা খুলে দেবে না।

রমজান। আর বলিস না রমজানের দুটো বিবিকে পিটিয়ে পিটিয়ে যা হাল করেছে, তাদের মৌত হলেই রমজান আর দুই বিবির তালাসে বের হবে। ওই ড্যাকরার কথা বাদ দে। তুই কিন্তু লড়াইতে যাসনে ফরিদ। তোর আল্লার কসম।

জনাই মুখ ঘুরিয়ে সোঁতার দিকে রওনা হল।

সবাই শুনেছে জুম্মাবারে আল্ হাজ পীর মওলানা ছামছুল হক সাহেব আল-কাদেরী কেবলা সাহেব চরের মুসলমানদের জমায়েতে খোদার বাণী শোনাবে। পবিত্র কোরাণ শরীফ পাঠ করবে, মুসলমানদের সুন্নতী এলেম দেবে। এই জমায়েতের জন্য ফইম হাজি তিনদিন আগে এসে সব ব্যবস্থার নির্দেশ দিচ্ছে। তার অনুগত লোকেরা মাঝের গাঁয়ের মাঠে নর্দমার মত করে লম্বা গর্ত কেটেছে। নদীর ওপার থেকে নৌকা বোঝাই জ্বালানী কাঠ আনা হয়েছে।

আগের দিন থেকেই নৌকা বোঝাই দিয়ে বিভিন্ন চর থেকে লোক আসছে, তারা সঙ্গে এনেছে চাল ডাল আনাজ তরকারী, কেউ এসেছে দু-একটা মোরগ, কেউ এনেছে ক্ষেতের লঙ্কা। শহর থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে বড় বড় ডেকচি কড়াই। ছোট একটা নৌকা ঘসে মেজে এনে রাখা হয়েছে মাঠের ধারে সেই কাটা নর্দমার পাশে। আগের দিন যারা এসেছে তারা চরে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। আগন্তুক দলে একজনও মহিলা নেই, সবাই পুরুষ, সবাই আহুত, অনাহুতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সকাল হতেই সেই নর্দমার উপর ডেকচি কড়াই বসিয়ে জ্বালানী ভর্তি করে আগুন দিল ফইমের সর্বাধিক অনুগত রমজান আলি। চুল্লা জ্বলছে, ডেকচি বোঝাই জল, সমাগত ভক্তরা চাল ডাল ঢেলে দিচ্ছে, তাতে লবণ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ফোটানো হচ্ছে। মুরগী ছাড়িয়ে গোটা গোটা মুরগী তার মধ্যেই ফেলে দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে অপূর্ব স্বাদের খিচুঁড়ি। এক ডেকচি খিচুঁড়ি রান্না শেষ হতেই তা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে পাশের নৌকায়। সারা দিন ধরে চলছে রান্না। তারপর যে যার নিজের মত কলাপাতায়, সানকিতে খিচুঁড়ি তুলে নিয়ে খেতে বসছে লাইন দিয়ে। দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই সবাই সমবেত হল মাঝের গাঁয়ের মাঠে।

পীরসাহেব তশরিফ রেখেছিল ছোলেমানের বাড়িতে। সেখান থেকে সোজা এসে হাজির হল সভায়। তারজন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল মঞ্চ। পীরসাহেব সোজা গিয়ে উঠল সেই মঞ্চে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছরের নমাজ পড়ে তার বক্তব্য পেশ করতে থাকে সমবেত জনতার সামনে।

অনেক ধর্মকথা শোনাল ভক্তদের কিন্তু তার বক্তব্যের মাঝে একটা কথা স্পষ্ট শোনা গেল। মুসলমানরা যে আলাদা কৌম আর হিন্দুরা তাদের ধর্মের ও দৈনন্দিন জীবনকে ক্রমাগত যে আঘাত করছে তার মনগড়া বিবরণ দিল। অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দিতে মোটেই ত্রুটি করেনি। আর জনতাকে সম্বোধন করে বলল, তোমাদের খাঁটি মুসলমান তৈরিই আমার প্রথম ও শেষ কাজ।

রমজান সবাইকে জানিয়ে দিল পীরসাহেব আগামী দু-তিনদিন হোগলবাড়িয়ার চরে থাকবে মুরুব্বীলোকদের মুসলমানীর তালিম দিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই জনতার ফেরার পালা শুরু হল। সবাই এক মুখে পীরের প্রশংসা করতে করতে যাচ্ছিল, এমন কি যারা কখনও নমাজ পড়েনি তারা যখন পীরকে নমাজ পড়তে দেখেছিল তারাও সঙ্গে সঙ্গে উঠবস করেছিল। তারাও প্রশংসামুখর হয়েই ঘরে ফিরছিল। অনেকে খিঁচুড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা ফইম হাজির কাছে শুনেছে আজমীর শরীফে মইনুদ্দিন চিস্তির দরগায় উরস উৎসবে এই রকম খিঁচুড়ি খাওয়ানো হয়। ফইম হাজি যে একজন করিতকর্মা লোক সে কথাও সবাই বার বার বলেছে।

জমায়েতে ফরিদ যায়নি। সারাদিন বাছুরডোবার মাঠে চাষ্ট মোড়লদের আনাজের ক্ষেতে বসেছিল সূর্য যখন পাটে বসেছে তখন ধীরে ধীরে আনাজ ক্ষেত থেকে উঠে সোজা গেল রামুমণ্ডলের বাড়িতে।

কি রে ফরিদ, তুই পীরের জমায়েতে যাসনি?

ফরিদ মৃদুস্বরে বলল, না কাকা।

কেন রে? শুনলাম পীরসাহেব অনেক ধর্মকথা বলেছে। যারা গিয়েছিল তারাই বলছে, সারা জীবনে এমন ধর্মকথা নাকি কেউ বলেনি।

ভাল কথা। তোমার ঘরে মুড়িটুরি কিছু আছে কি?

তোর খাওয়া হয়নি বুঝি। আয় ভিতরে আয়। ও ননীর মা, এদিকে এস। ফরিদকে কিছু জলপান দাও। কাল শহর থেকে ভাল খাগড়াই এনেছি, মুড়ির সঙ্গে খাগড়াই দিও।

ফরিদ দাওয়াতে বসে পড়ল।

ননীর মা নিশ্চিন্তিবালা বাটিতে করে মুড়ি-খাগড়াই দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলি রে ফরিদ, খাওয়া হয়নি কেন?

ছিলাম তোমাদের ক্ষেতে। বাড়ি যেতে মন চায়নি।

নিশ্চিন্তিবালা বলল, হাসিনা পালানোর পর তুই কেমন যেন হয়ে গেছিস। আবার বিয়ে কর ফরিদ। সংসারে মন বসবে।

ফরিদ শুধু হাসল।

খাওয়া শেষ করে ফরিদ বলল, এবার ঘর যাব কাকী। রামুকাকাকে বলবে কাল আমি তার নাওতে শহরে যেতে পারি।

ফরিদ ঘুরতে ঘুরতে একটু রাত করে ঘরে ফিরতেই ফেলানিবিবি বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

বাছুরডোবায়।

পীরের জমায়েতে যাসনি কেন?

জানি না। তুই যাসনি কেন?

আমরা বিটি ছাওয়াল, আমাদের যাওয়া মানা। মেয়েরা জমায়েতে যাবে না, মসজিদে যাবে না, এটাই হল খোদার হুকুম।

তুই যাসনি, তাই আমিও যাইনি। মা না গেলে ছেলে যায় কেমন করে।

ফেলানিবিবি হাসল। ফরিদ আব কোন কথা না বলে চাটাই পেতে শুয়ে পড়ল।

খাবি না? সারাদিন পেটে দানা পানি কিছু পড়েছে কি? নে ওঠ মাছের ছালুন দিয়ে ভাত খেয়ে নে। জেলেপাড়ার রবি হালদারের বউ কিছু কুচো দিয়ে গিয়েছিল। তারই ছালুন। ওঠ, ওঠ, খেয়ে নে তোর তরে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে দেখছি।

খেতে খেতে ফরিদ ভাবছিল হরো মোড়লের কথা। সেও জিজ্ঞেস করেছিল তুই জমায়েতে যাসনি?

উদাসভাবে হরো মোড়লের দিকে তাকিয়ে থেকে কোন জবাব না দিয়ে বসেছিল জমির আইলে।

ফেলানিবিবির কথার জবাব না দিলে কিছুতেই ছাড়বে না। বলল, তুই আবার গলায় দড়ি দিবি কেন?

তোর তরে। হাসিনা হাসিনা করে তুই বিবাগী হবি তা সহ্য

হয় না। আবার তোর বিয়ে দেব। ভাল মেয়ে খুঁজছি। ছোলেমানের বিটি তোর পছন্দ হয়? তোর বাপ ছোলেমানের সঙ্গে কথা বলবে।

ফরিদ মাথা নিচু করে খেতে থাকে। কোন জবাব দিল না।

দুদিন পর হাসিম এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, সর্বনাশ!

কিসের সর্বনাশ রে?

বুড়া পীরের রস জমেছে। ছোলেমানের বিটিকে নিকে করতে চায়।

কে বলল তোকে?

যার নিকে সেই বলেছে। আজ বিহানে ঘাটে দেখা। ডেকে বলল, হাসিম তোর কপাল পুড়ল। পীরসাহেব আমাকে নিকা করতে চান। আমি বললাম, ধুত্, তা কি হয়। পীরসাহেবের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে. আর তোর বয়স ষলো-সতের। তোর বাপ রাজি হয়েছে? ও বলল, খুশি মনেই হাঁ বলেছে।

ফরিদ বলল, তা হলে কথাটা ঠিক।

হাসিম কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, কি করি বলত ফরিদ। আমার কলিজা ফাটার জোগাড়।

ছোলেমানের বিটি কি রাজি? সে কি বলে?

সে শুধু কেঁদেছে। কোন কিছুই বলতে চায় না। বলল, তুমি একটা ব্যবস্থা কর। আমি কি ব্যবস্থা করতে পারি বলত। বললাম, চারঘাটে যেতে পারবি? ও বলল, যাব।

ফরিদ বলল, তাতো বুঝলাম। বিয়ের বিবি না হলে অনেক হাঙ্গামা।

কি করি বলত?

চারঘাটেই তুই যা। ছোলেমানের বিটিকে বলিস, কারও সঙ্গে কদিন পর সে-ও যেন চারঘাটে যায়। সেখানে তোদের বিয়ের কলমা পরার ব্যবস্থা করব।

থানা পুলিস হবে না তো?

ফরিদ হেসে বলল, পীরের মর্জি। বাঘের মুখ থেকে শিকার

ছিনিয়ে নিলে বাঘ কি সহজে বাগ মানে! আঁচড় কামড় সহ্য করতে হয়। হয়ত তোকেও তা করতে হবে, তবে কচিবিবি যাতে পীরের ঘরে না যায় সে ব্যবস্থা আমি করব। এখানে ছোলেমানকে সায়েস্তা করবে আলকাপের দল। তুই যা ছোলেমানের বিটির সঙ্গে পাকা কথা বলে আয়। তবে পীরবাবা নাছোড়বান্দা বলেই মনে হয়। খুব সাবধান, পাঁচ কান না হয় যেন।

হাসিমকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়ে ফরিদ একাই ঘুরতে থাকে চরের কিনারায়। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামল। আকাশে দেখা দিল চতুর্দশীর চাঁদ। রূপোর হাট বসল চরের বালিতে। রূপোলি ঢেউ উঠল নদীর বুকে। দূরের মানুষ স্পষ্ট না হলেও ছায়াগুলো দেখা যাচ্ছে। নদী আর সোঁতার বুক বেয়ে মিষ্টি বাতাস ছুটে বেড়াচ্ছে, জুড়িয়ে দিচ্ছে তপ্ত দেহটাকে। চাঁইপাড়ার কোন কোন কুটিরে মিটমিটে আলো জ্বলছে, সেই জোনাকির মত আলো যেন হাতছানি দিয়ে নীরবে ডাকছে দূরের মানুষকে, রাতের বেলায় পথের নিশানা জানাচ্ছে। একটা ঢিবির ওপর চেপে বসল ফরিদ। লক্ষ্য করল একটা ছায়া দূর থেকে ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ফরিদ জোর গলায় জিজ্ঞেস করল, কে, কে ওখানে?

উল্টো দিক থেকে একই প্রশ্ন করল মেয়েলি গলায়।

আমি, আমি ফরিদ, তুই কে?

মেয়েটা এগিয়ে এল। কাছে এসে বলল, রাত হয়েছে। তুই এখানে কেন। আমরা এই গাঁয়ের মানুষ, তুই তো অন্য গাঁয়ের।

তোর গাঁ আমার গাঁ কত দূর রে জনাই?

তা তিন রশি হবে। এপাড়া আর ওপাড়া।

তাই বটে। মনটা ভাল ছিল না রে। সোতার ধারে বসে ছিলাম। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

জেলেপাড়ায় গিয়েছিলাম। ঘর ফিরছি। তুই ঘর যা ফরিদ। বেশ হিম পড়ছে।

হিম! বলেই ফরিদ চুপ করে গেল।

জনাই জিজ্ঞস করল, লড়াইতে তো গেলি না। যাবি কি?

যাব। তাতে তোর কি? তুই ঘর যা জনাই। লোকে দেখলে বদনাম করবে।

জনাই খিল খিল করে হেসে বলল, সবাই আমাকে চেনে। তোর ডর থাকে তুই ঘর যা। আমি তো ঘরে যাবই। যদি কেউ খারাপ কেচ্ছা করে তার মুখ আমি ভেঙ্গে দেব। চাঁইদের ঘরের মেয়েদের সবাই ডরায়, বুঝলি। তুই কিন্তু লড়াইতে যাসনি ফরিদ।

জনাইয়ের হাসিটা বড় মিঠে লাগে ফরিদের। কাছে ডেকে নেবার সাহস তার ছিল না। বিষধর ফণিনী চাঁইদের মেয়ে। হঠাৎ ছোবল দিলে আর রক্ষা নেই, ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করা যায়, চাঁইদের মেয়েরা ডাকাতের বাড়া, তাদের সঙ্গে লড়াই করলে জান যাবে। সালিশ বসবে, বেইজ্জত করবে জনাই যদি বিগড়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই। চাঁদা করে পেটাই হবে।

ফরিদ টিপি থেকে নেমে উল্টোপথ ধরল। জনাই পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাস ফরিদ? আমার কথার জবাব দিসনি, জবাব দিয়ে যা!

ঘরে যাব। তোর কথার জবাব দিতে পারব না।

ডর লাগছে বিটি ছাওয়াল দেখে। তুই লড়াই করবি? পালা শীগ্গীর। চাঁইপাড়ার মেয়েরা মরদ লোককে ঠ্যাঙাতে ওস্তাদ।

ভয় দেখাচ্ছিস? আমার কসুর। তুই তো যেতে বললি।

সে কথা তুই বুঝবি নে। তুই ইধারে আর আসিসনি।

ফরিদ কি বুঝল তা জানা গেল না। ফরিদ কয়েক পা এগোতেই জনাই তাকে ডেকে আবার বলল, ও ফরিদ, আলকাপ একেবারে বাদ দিলি!

তাই ঠিক করেছি।

কেন রে?

ভাল লাগে না।

ইস্। তোর বউ ভেগেছে, তাই বিবাগী।

জানি না।

তুই আবার বিয়ে কর ফরিদ। তোর মনমেজাজ বউ এলেই ঠিক হয়ে যাবে। দেশের লোক আলকাপ শুনতে পাবে।

আমাকে কে বিয়ে করবে বল। আমি নিকম্মা লোক। কাজ করার হিম্মত নেই। নাচার লোককে কেউ কি বিয়ে করে? বউ ঘরে আনলেই সে যে ঘর করবে তারই বা ঠিক কি?

করবে রে করবে। খুঁজে নিতে জানিস না তাই।

ফরিদ কোন জবাব না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে মাঝের গাঁয়ের দিকে এগোতে থাকে। জনাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ফরিদের ছায়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

এরপর থেকে ফরিদ আর বাছুরডোবার চরে যায় না। গাজিপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বড় গাঙ্গে যায় মাছ ধরতে। কখন ভাটিতে যায় ইলিশ ধরতে। ভাল মাছ উঠলে ভাগও পায়। মাঝে একদিন হাসিম এসে জানিয়ে গেছে, ছোলেমানের বিটির সঙ্গে পীরসাহেবের সাদ হয়ে গেছে। পীরসাহেব নতুন বিবি নিয়ে পোড়ামাটিতে চলে গেছে।

বিয়ের আগে হাসিম তার আর্জি জানিয়ে এই বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিল। ছোলেমান চোখ পাকিয়ে বলেছিল, তোর আক্কেল ভাল নয়। পীরসাহেব দয়া করে আমার মেয়েকে পায়েতে ঠাই দিয়েছে আর তুই কিনা বলিস, কামডা ভাল নয়। তোর সঙ্গে বিয়ে দিলে বুঝি খুব ভাল কাম হোত। বলিহারি তোর বুদ্ধি। সাতদিন বাদে তোকেই আমার বিটিকে বলতে হবে পীরমা। এমন তগদীর কজনের হয়? যা যা নিজের কামে যা।

নিরাশ মনে হাসিম ফিরে এল। মনের দুঃখে বনে না গিয়ে কয়েকদিন ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে ভূমিশয্যা নিয়েছিল। মনের ব্যথা কিছুটা কমলে ছুটে গিয়েছিল ফরিদের কাছে। বিয়ে হয়ে গেলে করার কিছু থাকে না। শুনল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আপশোষ করল। ছোলেমানের বিটির জন্য কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলল। ব্যর্থ

প্রেমিক হাসিম তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার ব্যথার মতই প্রখর ভাবে তার মনে আঁচড় কাটলেও করার কিছুই ছিল না।

কেমন একটা বিতৃষ্ণা দেখা দিল ফরিদের মনে। কোন কাজ খুঁজে না পেয়ে মন শক্ত করে জেলেদের দলে গিয়ে ভিড়ল। পদ্মার ঢেউয়ের তালে তালে জেলেদের নৌকা নেচে নেচে কখনও উজানে কখনও ভাটিতে ভেসে চলত। ফরিদ কখনও হাল ধরত, কখনও বৈঠা টানত, কখনও জাল টানত। কোন কোন দিন শেষরাতে মাছ হাতে করে ঘরে ফিরলে ফেলানিবিবি খুবই রাগ করত। মুখে কিছু বলত না কিন্তু অত রাতে মাছ কাটা, নুন মাখানো কাজ মোটেই পছন্দ করত না। আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিত এত রাতে ঘুম ভাঙ্গালে দেহটা মোটেই ভাল যায় না। ফেলানিবিবির অসন্তুষ্টির আসল কারণ রাতের বেলায় পদ্মার মত দুরন্ত নদীতে ছোট্ট জেলে ডিঙ্গি করে পাড়ি দেওয়া। রোজই বলত, বড় গাঙ্গে যাসনি ফরিদ। আমার ডর করে। আল্লার কসম, বড় গাঙ্গে যাস না।

ফরিদ বলত, আমি তো একা নই জেলেপাড়ার লোকও থাকে নাওতে। ওরাও দল বেঁধে যায় অনেকগুলো নাও ভাসায়। তোর ছেলেই বুঝি দুনিয়ার একটা ছেলে। ওদেরও তো মা আছে :

ওদের কথা ভিন্ন। আমার ঘরে তুই একটাই ব্যাটা। ওদের জাতজন্ম নদীর পানিতে, আমাদের জাতজন্ম মাটিতে, বালির চরে। দরিয়ার পানিকে আমার বড়ই ভয়। তুই যাস না ফরিদ।

ফেলানিবিবি যতই নিষেধ করুক, অনুযোগ করুক। বিকেল বেলায় গরম ভাত পেটে পড়লেই ফরিদ বেরিয়ে পড়ে জেলেপাড়ার উদ্দেশ্যে। কোন কোন রাত কাবার হয়ে যায় নদীর বুকে।

কদিন পর সকালবেলায় বাড়ি ফিরতেই ফেলানিবিবি বলল, হাসিম এসেছিল তোকে খুঁজতে।

কিছু কইছে কি ?

তেমন কিছু নয়। আউশের সময় হল। বোশেখেই আউশ ফেলতে হয় রে ব্যাটা। আর বলছিল একটা শালিস ডাকতে।

কিসের শালিস ?

নুরুদের বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়ে গেছে। তারই বোধহয় শালিস।

আজ অব্দি শালিস করে মুরুব্বীরা। বড়ই হারামি। ওরা আটগণ্ডা পয়সার কাঙ্গাল। যে বেশি দেবে তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে তাই মুরুব্বীদের সঙ্গে জোয়ান মরদরাও শালিসীতে বসবে, সবাই ঠিক করেছে।

বেশ তাই হবে। কবে শালিসী তা বলেনি ?

তুই যা হাসিমের কাছে। শুনে নে।

ফরিদ নুরুদের ঘটনা কিছু কিছু জানে। কোন মন্তব্য করল না, কিছু জিজ্ঞেসও করল না তার মাকে। কদিন আগে নুরুর সঙ্গে গাজিপাড়ায় দেখা হয়েছিল। ফরিদকে দেখেই নুরু এগিয়ে এসে বলেছিল, তোর সঙ্গে একটা শলাপরামর্শ দরকার।

কিসের ?

শুনলাম, শহরে নাকি সিপাইয়ের চাকরি দিচ্ছে সরকার। জোয়ান ছেলেদের সিপাইতে ভর্তি করছে। আমি ভাবছি নাম লেখাব।

ফরিদ উৎসাহিতভাবে বলল, লড়াইতে যাবি নুরু ? যদি যাস তা হলে নাম লেখাস।

লড়াইতে না গিয়ে উপায় নেই ফরিদ ভাই। ঘরে যা লড়াই চলছে তাতে মাথা খারাপ হবার মত হয়েছে। বাঁচতে হলে অন্য লড়াইতেই যেতে হবে।

নুরুর বাড়ির কিছু কিছু ঘটনা শুনেছেও। আজ ফেলানিবিবি যখন বলল নুরুদের বাড়ির ঝামেলার কথা তখন কোন প্রশ্ন না করে চুপ করেই ছিল।

ফেলানিবিবি বলল, কথা বলছিস না কেন ? আউশের সময় হয়েছে। কোন কথাইতো বললি না। মিঞা বলছিল তোর কথা।

বাপজান কি বলেছে ?

সে আর কি কইবে ! আমি-ই তো বলছি। বড়মিঞা নমাজ

শিখতে গেছে। পীরের মুরীদ হয়েছে। দিনরাত তসবি ঘোরায় আর আল্লার নাম করে। আমরা মা-বেটা কি খাব তাও চিন্তা করে না। এবছর ঘরে দানা নেই, আউশ না উঠলে পেটে গামছা বেঁধে থাকতে হবে। আল্লা তো বলেনি হাত পা থাকতে কাজ কাম করিস না, দানাপানি তো হাঁটতে হাঁটতে পেটে গিয়ে ঢুকবে না। মেহনত করলে তবেই পেট ভর্তি হবে বাপ্।

হাল নেই যে মা!

কিনতে হবে। গত সালে তিনটাকা দাম গেছে। ইবার তুই চেষ্টা কর। কম দামেও হাল পেতে পারিস। তিনদিন হাল দরকার। চষা-মই দেওয়া সব নিয়ে। তোর বাপ্‌কে কতবার বলেছি নিজে হাল কর, সে কথা কানেই তোলেনি। এবার মজাটা বোঝ। ভরসা তো একটা গাই, সেটাও শুকনো। শহরের গোয়ালরা আসে, দাদন নিতে সাহস পাই না। যা হয় একটা কিছু কর।

গোয়ালদের দাদন নিসনি তো?

না। তবে নিতে হবে। হাল কেনার পয়সা কোথায় পাবি। গোয়ালদের কাছ থেকে দাদন পেলে চাষের সময় তোর কাজে লাগবে।

তা বটে! দেখি দাম দর করে।

এবার আউশপাকার আগেই বানের জল ঢুকল চরের জমিতে। কাঁচা-পাকা ধান কেটে তুলল ঘরে চরের চাষীরা। গত সনের আমন ধান প্রায় সবার ঘরেই শেষ। শ্রাবণ থেকে কার্তিক অবধি আউশ ভরসা। এবার আউশের ফসল না থাকার মতই। সবাই মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে চার-পাঁচটা পেট চলবে কি করে। বিকল্প কোন চাষের উপযোগী নয় চরের জমি। তবুও নৈমুদ্দি শকরখন্দের চাষ করে প্রতি বছর। ধানে না কুলালে শকরখন্দের উপর নির্ভর করে। শকরখন্দ সেদ্ধ করে নুন লঙ্কা দিয়ে খায় তার গোটা পরিবার।

নুরুর বাপের তিন বিবি। জমি কম হলেও কঠিন পরিশ্রম করে তারা সারা বছর ধরেই। আনাজ তরকারী যা হয় তাতেই কুলিয়ে যায় গোটা বছরের তরকারীর চাহিদা। সারা বছর কিছু না কিছু ফসল

ওঠায়। কামলা, মুনীষ, পাইটের খরচ জোগাতে হয় না। তিন বিবির ছেলেমেয়েরা মাঠে যায়। মেহনত করে। তবুও হিমশিম খেতে হয় বছরের খোরাক জোটাতে। নুরুর বাবার তবুও খেদ নেই। খোদার মাল বলেই খালাস। সে বিশ্বাস করে খোদার মাল, সন্তান-সন্ততির মুখে দানাপানি তুলে দেবে স্বয়ং আল্লা। এই ভাবেই চলছিল তার সংসার। বাদ-বিসম্বাদ যা হয় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

কিন্তু সব কিছুই সমান তালে তো চলে না। ছেদ আছে। ভাঙ্গন আছে। নুরুর বাড়িতেও ছেদ থাকলে ভাঙ্গন ছিল না। সেদিন বিকেলবেলায় মাঠ থেকে ফিরেই যত হাঙ্গামা। তিন বউ তাদের নিজ নিজ অংশ নিয়ে ঝগড়া কাজিয়াতে নেমে পড়েছে। এত কাল সবাই লক্ষ্য করেছে ঝগড়া কাজিয়া চরমে উঠলে নুরুর বাবা প্রথমে সবাইকে শান্ত করতে চেষ্টা করে, তাতেও যখন হয় না তখন সেই আদিম ঔষধ প্রয়োগ করে দুই বিবিকে উঠানে ধাক্কা দিয়ে ফেলে রেখে ছোট বিবির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে রাত কাটায়। দুই বিবির সর্বাঙ্গে কালশিরে দাগ। তাই নিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় নুরুর বাবাকে গালিগালাজ করতে করতে নিজ নিজ ঘরে ঢুকে গায়ে হাতে পায়ে গরম তেল মালিশ করে।

নুরুর মা প্রথম বিবি। তার বয়সের গাছ পাথর নেই, তার দাবী সবচেয়ে বেশি। সংসারে সবচেয়ে বেশি মেহনত করে সে নিজে আর তার ছেলেরা। তার দাবীর স্বপক্ষে যতই যুক্তি থাক প্রায় বিগতযৌবনা নারীর দাবীর প্রতি সুবিচার করে নুরুর বাবা তার লাঠির মাহাত্ম্য প্রচার করে। নুরুর মা নীরবে সহ্য করেছে প্রথম বয়সে, এখন আর তা সহ্য করে না। যুক্তি যখন হার মানে তখন যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শোনায় তার তুলনা কোন অভিধানের শব্দ সম্ভারে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রহমানের তালাকি বিবি রহিমকে নিকে করে এনেছিল নুরুর বাবা। কাবিলনামায় স্বীকার করেছিল নগদ তিনশ টাকা মোহরানা আর তিন বিঘে জমি। নুরুর বাবা সবাইকে বলেছিল, চাষের কাজে লোক দরকার তাই নতুন বিবি আমদানী করেছে।

দ্বিতীয় বিবি রহিমা বেশ শক্ত মেয়ে। রহমানের ঘর করেছে সাত বছর। সাত বছরে রহমানের হাড়ে দুর্বাঘাস জন্মিয়ে এসেছে। তার মুখের অমৃতবাণী শুনে রহমানের মা ঘোড়ামারার চরে গিয়ে আবদুল্লার বাড়িতে চাকরাণীর কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। সংসারের পক্ষে সে পাকাপোক্ত মেয়ে। নুরুদের বাড়িতে আসার পরই নুরুর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া বাধিয়ে বসেছিল। বিশেষ করে মিঞা কোথায় রাত কাটাবে তা নিয়ে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল সৃষ্টি করত রহিমা। কিছুতেই তার স্বামীকে নুরুদের ঘরে যেতে দিত না। প্রথম প্রথম ঝগড়া-কাজিয়া হলেই নুরুর বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। কারও দাওয়াতে বসে গল্প করত, অনেক রাতই সে চরের কোন নিভৃত স্থানে চাটাই পেতে শুয়ে রাত কাটাত। তাতেও তার শান্তি ছিল না, কোন কোন রাতে তার সন্ধান পেয়ে রহিমা এসে হাজির হয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধাতো। কিছুতেই যখন দুই বউকে থামাতে পারল না তখন স্থির করল আরও একটা বিবি এনে দুজনকেই জব্দ করবে।

সুফিয়া বেওফা। প্রথম স্বামীর ইন্তেকাল হয়েছে কঠিন রক্ত আমাশার রোগে। ছয় মাস না যেতেই নুরুর বাবা খবর পেয়েছিল এই অসহায় বিধবার। তারপরই লোক লাগাল, প্রলোভন দেখাল। অবশেষে ছয় বিঘে জমি আর নগদ পাঁচশ টাকা কবুল করে সপ্তদশী সুফিয়াকে নিকা করে ঘরে আনল। সুফিয়া ঘরে এসেই সব কিছু দখল করে নিল। যেদিন অপর দুই সতীনের ঝগড়া চরমে উঠত সেদিন সুফিয়া এগিয়ে এসে লাঠি তুলে দিত নুরুর বাবার হাতে কাজিয়া থামাতে। এর ফলে নুরুর মা আর রহিমাকে মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী হয়ে কাজিয়া করার ঋণ-শোধ দিতে হত। নুরুর বাবা নির্বিকার। এদের যন্ত্রণার জন্য একবার আহাও বলত না।

নিত্যকার এসব ঘটনা মোটেই ভাল লাগত না নুরুর। সারাদিন মাঠে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখত, সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে বসত আলকাপের মহরায়। অনেক রাতে বাড়িতে এসে মাকে ডেকে তুলত, কোন রকমে ভাত মুখে দিয়ে বারান্দায় চাটাই পেতে

শুয়ে পড়ত। আকাশ পরিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ত। চলে যেত চরের জমিতে। কাজ না থাকলেও জমিতে বসে দিন কাটাত। নুরু এতকাল এসব মুখ বুঁজেই সহ্য করেছে, এখন সহ্যের সীমা যেন অতিক্রম করেছে। তাই ঠিক করেছে লড়াইতে যাবে। সিপাইদের খাতায় নাম লেখাবে।

নুরুর বাবা জানে, যার সন্তান সংখ্যা বেশি চাষ আবাদে তার সুবিধা বেশি। পয়সা দিয়ে কামলা, মুনীষ, পাইট রাখতে হয় না। ছেলেমেয়েরা পেট ভাতায় যত কাজ করবে পয়সা দিয়ে অত কাজ পাবে না অন্যের কাছ থেকে। বোধহয় এই কারণেই নুরুর বাবা অনেক সময় ঠিক করতে পারে না তার কটা ছেলেমেয়ে। খোদার মালদের ছেড়ে দেয় নিজেদের রুটি রুজির সন্ধানে, উদ্বৃত্তটা তার পাওনা। তবে একেবারে বোকা লোক নয়। সে ভাল করেই জানে, এখন যারা তার ঘর গুছিয়ে দিচ্ছে, তারাই বড় হলে ভবিষ্যতে ঘর ভাঙ্গবে নিজেদের ঘর গড়তে। এই কারণেই সে বিবিদের তালাক দেবার চিন্তাও করে না। তালাক দিলেই জমি ছাড়তে হবে, নগদ কড়ি গুণে দিতে হবে মোহরাণার ক্ষতিপূরণ করতে। তাই এত ঝগড়া কাজিয়ার ঝামেলা সহ্য করেও সে চুপ করে থাকত, ঝগড়া কাজিয়া থামাত লাঠির ডগায়।

ফরিদের মার মৃত্যুর পর এনায়েত ফকির নিকা করেছিল ফেলানিবিবিকে। ঘর সামলানো আর ফরিদকে যত্ন করতে বিবির দরকার। দরকারটা পুরোপুরি পূরণ করেছিল ফেলানিবিবি। ফরিদের বিয়ের বয়স হতেই হাসিনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, হাসিনাই ঘর সামলাবে। তা আর হল না। হাসিনাই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার আশা-আকাঙ্খা মেটাতে। যেদিন ফরিদের হাত ধরে শহরে গিয়েছিল সেই দিনই সে বুঝেছিল ঘর তার ভাঙ্গল, হয়ত ফরিদের ঘরও ভাঙ্গবে। হাসিনাকে নিয়ে ফরিদ নৌকায় উঠল, ফেলানিবিবি গোপনে চোখ মুছল, খোদার কাছে দোয়া চেয়েছিল ওরা যেন সুখে থাকে। ফরিদের ছয় মাসও কাটল না। ফরিদ নানা ভাবে তোয়াজ করে সুখে রাখতেই চেয়েছিল। সারাদিন মেহনত

করে যা উপার্জন করত তা তুলে দিত হাসিনার হাতে। কিন্তু হাসিনাকে খুশি করতে পারেনি। একদিন কাজের শেষে বাড়ি ফিরে দেখল, ঘরখালি, হাসিনা ঘরে নেই।

পাশের বাড়ির কেরামত বলল, খবিরের সঙ্গে হাসিনা ঘর ছেড়েছে।

বোকার মত দাঁড়িয়ে শুনল, কোন কথা বলল না।

কয়েকদিন খবিরের বাড়ির আশে পাশে ঘুরেছিল ফরিদ যদি কোন রকমে হাসিনার দেখা পায় কিন্তু বৃথা চেষ্টা। খবিরের বাড়ির দরজা জানলা কোনটাই খোলা ছিল না।

এই কঠিন ধাক্কা সামলে ফরিদ বাড়ি ফিরেই নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল আলকাপের গানে আর নাচে। ছোটবেলা থেকেই ফরিদ গান গাইত ভাল। শুনে শুনে অপরের গান নকল করতে পারত, তার গলাও ছিল সুরেলা। শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে শুনত গ্রামোফোন রেকর্ডের গান। সেই সব গান গাইত চরের ফাঁকা মাঠে। তখন থেকেই ওরা চিন্তা করেছে আলকাপ গানের দল গড়ে তোলার। কাতলামারির চরে কখনও কখনও ওরা গেছে, সেখানেই দেখেছে আলকাপের জমায়েত, কখনও কখনও চারঘাটের হাটেও শুনে এসেছে আলকাপ গান। তখনই ওরা নিজেদের গ্রামে এসে আলকাপের নাচ গানের মহরা দিতে আরম্ভ করেছে। এই গানই হল ফরিদের কাল। তার গানের মোহে মেতে উঠেছিল হাসিনা। গাজিপুরের ইমান শেখের ছোটমেয়ে হাসিনার সঙ্গে কি করে পরিচয় হয়েছিল ফরিদের তা ঠিক করে ফরিদ বলতে না পারলেও ফেলানিবিবি সন্দেহ করেছিল ফরিদের নজর আছে হাসিনার ওপর। এনায়েত ফকিরকে বলেই ফেলানিবিবি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল ইমান শেখের কাছে। প্রস্তাব মঞ্জুর হতেই বিয়েটাও হয়ে গিয়েছিল।

হাসিনা হারিয়ে গেছে ফরিদের জীবন থেকে।

ফরিদও হারিয়ে গেছে আলকাপের দল থেকে।

হাসিম ছোলেমানের বিটির আশা এখনও ছাড়তে পারেনি। সেও বিবাগী হবার উপক্রম। কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব সর্বত্রই।

ফেলানিবিবি তখনও আশা ছাড়েনি। মাঝে মাঝেই ফরিদকে বলে, তুই বিয়ে কর ফরিদ। তোকে এভাবে ঘুরতে দেখলে বুক ফেটে যায়। আমার কথা শোন, আবার বিয়ে করে ঘর সংসার কর।

ফরিদ উত্তর দিত না হাসত।

হাসিস কেন রে ব্যাটা ?

তোর সখ তো কম নয়। এখনও সখ মেটেনি। একটা বউ পেয়ে জীবন ঠাণ্ডা, আর দরকার নেই।

গাজিপুরের ইমান শেখের পাঁচ মেয়ের সবার ছোট হাসিনা। আদরে আহ্লাদে হাসিনা ছিল ডগমগ। হাসিনার আবদারও বেশি। ফরিদ তাব আবদার রক্ষা করতে না পেরে ঘর ছেড়ে শহরে গিয়েও হালে পানি পায়নি। কেমন একটা বিতৃষ্ণা মেয়েদের ওপর জন্মেছে হাসিনা পালিয়ে যাবার পব থেকেই। মেয়েদের বিশ্বাস করতে পারে না। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে তার এই পরাজয় শুধু ভালবাসার প্রতি চরম অবমাননা নয়, পুরুষের প্রতি নারীর অবিচার অথচ যখনই সে তার সৎমা ফেলানিবিবির দিকে তাকিয়েছে তখনই মনে হয়েছে ভালবাসা হারিয়েও তার সৎমা যখন আশ্রয় চেয়েছিল তখনই আশ্রয় পেয়েছে হয়ত ভালবাসাও পেয়েছে তার বাবার কাছে। সে সব বড়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু নিজে পরখ করেছে তার সৎমা ভালবেসেছে এনায়েত ফকি্রর সংসারকে আর মা-হারা সতীনের ছেলেকে। অস্বাভাবিক হলেও তা স্পষ্ট এবং নির্মম সত্য। এনায়েত ফকির বেশ মেজাজী লোক। তার হাজার হাজার ফরমাইস আর হুকুম তালিম করতে কখনও ত্রুটি করেনি, অসন্তুষ্ট হয়নি, রাগ করেনি। আর ফরিদকে কোন সময়ই বুঝতে দেয়নি সে তার মা নয়। ফরিদকে কতটা যত্ন করা যায়, কতটা নিরাপদে রাখা যায় সেদিকে ছিল কঠোর দৃষ্টি। বিনা বাক্যব্যয়ে তার কর্ত্তব্য পালন করেছে, ভালবাসা, স্নেহ মায়া, মমতা দিয়ে ঘিরে রেখেছে ফরিদকে।

ফরিদ আবার মেতে উঠল আলকাপ নিয়ে। হাসিম অনেক ঘাটের জল খেয়ে ফিরে আসছে চরে। মুরুর ইচ্ছা থাকলেও লড়াইয়ে

যাবার জন্য সিপাইয়ের খাতায় নাম লেখাতে সাহস পায়নি। নৈমুদ্দির আগ্রহ বেশি। ধান কাটার পর থেকেই সে বার বার এসেছে ফরিদের কাছে। বার বার বলেছে, সব ভুলে যা ফরিদভাই। আবার দল গড়ে তোল।

ফরিদেরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আলকাপ বাদ দিয়ে বড়ই ভুল করেছে। অবশেষে মন স্থির করে নতুন করে দলের পত্তন করল। জেলেপাড়ার হারু আর পুরানো দিনের লখা এসে জুটল। মহরা আরম্ভ হল মাঝের গাঁয়ে।

ফরিদ গিয়েছিল শহরে মাদার নাচের চামর কিনতে। ফিরে আসার সময় নৌকাতে দেখা জনাইয়ের সঙ্গে। ফরিদকে নৌকায় উঠতে দেখে জনাই জিজ্ঞেস করল, কিরে ফরিদ লড়াইতে যাসনি?

যাব তো মনে করেছিলাম কিন্তু যাওয়া হল না।

কেন?

তুই তো মানা করেছিলি।

আমার কথায় তোর আখের নষ্ট করলি?

তা হবে। তবে অনেক ভেবেছি রে জনাই। কার জন্য লড়াই করব তা না জানলে কি যাওয়া যায়। তুই তো লায়েক হয়েছিস, রোজই শহরে যাস। শুনতে পাসনি, লড়াইতে কত লোক মরে ফৌত হয়ে গেছে। আবার শুনে এলাম, পুলিস সব নৌকা আটক করবে।

কেন রে?

সরকারের দুষমনরা যদি নৌকা চড়ে লড়াই করতে আসে। অবাক কাণ্ড, কত রেল, কত মোটর গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, হাওয়ায় জাহাজ, সে সব ছেড়ে নৌকা করে দুষমন আসবে।

জনাই হেসে বলল, নতুন বউ আসবে তাই সরকার নৌকা কাড়বে। লড়াই দিয়ে আমাদের কি হবে! তুই যদি যেতিস তা হলে ভাবতে হত, আমাদের চরের এত বড় গুণী লোকটা বিবাগী হয়ে লড়াইতে গেল। আহা!

আর কিছু নয়?

একটু কষ্ট হত। তাতে তো তোকে আটকানো যেত না। না গিয়ে

ভালই করেছিল। লখার মা বলছিল তোরা এবছরে আবার আলকাপের জমায়েত করবি, সত্যি ?

হাঁ রে হাঁ। চুপ করে কতদিন বসে থাকি বলত। দেহে ঘুণ ধরে যাবে। বুঝলি। তাই একটু নড়াচড়া করতে চাই।

তুই তো আমাদের গাঁয়ে আর আসিস না।

যাব কেন। তুই তো কসম দিয়ে মানা করেছিলি।

সে তো কথার কথা। তুই তো বলেছিলি লোকে নিন্দে করবে। তাই তোকে সাবধান করেছিলাম। আবার আসিস ফরিদ। তোর আল্লার কিরে, যা বলেছি তা মাপ করে দে। আসিস কিন্তু।

ফরিদ শুধু মাথা নাড়ল। সম্মতি-অসম্মতি জানা গেল না।

নৌকা থেকে নেমেই সোজা গাঁয়ের পথ ধরল ফরিদ। পেছন থেকে জনাইয়ের গলা শোনা গেল, আসিস কিন্তু ফরিদ।

কোন অস্থিরতা দেখা দিল না ফরিদের মনে।

আবার আলকাপের জমায়েত হয়েছে মাঝের গাঁয়ের মাঠে। আবাব লণ্ঠন আর মশালের আলো জ্বালান হয়েছে। হাসিম হারমোনিয়ম নিয়ে প্রস্তুত, নৈমুদ্দি একতারা আর ডুগি নিয়ে নেমেছে আসরে। কিছুটা দূরে লখা শাড়ি পড়ে মেয়ে সেজে অপেক্ষা করছে ফরিদের জন্য।

এক পায়ে নুপুর বেঁধে ফরিদ নাচতে নাচতে হাজির হল আসরে। পেছন পেছন এল লখা।

লখার দিকে আঙ্গুল তুলে ফরিদ গানে সুর দিল।

দিল মজালি জাত মজালি
ওরে বিবি সব মজালি
বাকি রইল কি ?

লখাও নাচতে নাচতে গান ধরল ঃ

বাকি রইলি তুই।
পীরিত করে নাগর সেজে
পালিয়ে গেলি বেহুদা কাজে
তোরে বাঁচাবে কে ?

দোহাররা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল, তোরে বাঁচাবে কে ?

ফরিদ এর জবাবে গাইতে থাকে ঃ

আল্লার রসুল মোর ভরসা
সেই বাঁচাবে, আর বাঁচাবে কে ?

দোহাররা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল, আর বাঁচাবে কে ! আল্লার রসুল, আর বাঁচাবে কে !

গভীর রাতে জমায়েত শেষ হল। ধীরে ধীরে শ্রোতারা ফিরে গেল নিজের নিজের আস্তানায়। সবাই প্রশংসায় মুখর। সবাই ফরিদের তারিফ করতে করতে ফিরছিল। হাসিম, নৈমুদ্দি, লখা মশাল নিভিয়ে লণ্ঠন নিয়ে প্রস্তুত হল ঘরে ফিরতে। ফরিদ বসে রইল পোয়ালের বিছানায়। আজ কৃষ্ণপক্ষের দশমী। শেষ রাতের চাঁদ উঠেছে, নদীর বুক বেয়ে মিঠে বাতাস ভেসে আসছে। বেমনা হয়ে ফরিদ বসেছিল হঠাৎ ডাক শুনল, ফরিদ। মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, মা, তুই ! তুই এখানে কেন ?

তুই যে ঘরে ফিরিসনি। তোকে নিয়ে বড়ই ভাবনা। ঘর চল।

তুই যা, আমি আসছি।

ফেলানিবিবি কিছুতেই ফরিদকে ছেড়ে যেতে রাজি হল না। ফরিদের হাতটা ধরে টেনে তুলল পোয়ালের বিছানা থেকে। ফরিদ নিরুপায়ের মত মায়ের পেছন পেছন চলতে চলতে বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

দাঁড়ালি কেন ?

না কিছু না, চল, খেতে দিবি, বড়ই খিদে পেয়েছে।

সকালবেলায় ফরিদ ঘাটে গিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল শহরে যাবার। হঠাৎ মন বদল করে ফিরে এল ঘাট থেকে। তখন ঝুড়ি বোঝাই আনাজ তরকারী নিয়ে চাঁইপাড়ার মেয়েরা কলরব করতে করতে ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। ফরিদ ভালভাবে তাকিয়ে দেখল তাদের মধ্যে জনাই নেই। রোজই তো জনাই যায় শহরে। শশীবালা আজকাল ঘরেই থাকে। শশীবালাকেও দেখতে পেল না। এমন তো সহসা ঘটে না। নদীর তোড় যদি বেয়াড়া হয় তখনই নৌকা ছাড়তে চায় না হালদাররা নইলে তাদের খেপ কখনও বন্ধ থাকে না।

ফরিদ ধীরে ধীরে চলতে চলতে কখন যে বাছুরডোবার চরে এসে গেছে খেয়াল করেনি। চরের মাঠে চাঁইদের মেয়েপুরুষ তখন কাজে ব্যস্ত। হরো মোড়লের ক্ষেত তার জানা। ক্ষেতের পাশে এসে দেখল, হরো মোড়ল অথবা শশীবালা কেউ নেই। আবার সে ফিরতি পথ ধরল।

ওই ফরিদ, ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ফরিদ। পেছন ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখল সে আর কেউ নয়, জনাই।

ফরিদ জিজ্ঞাসা করল, তোদের মাঠে কেউ নেই কেন রে জনাই?

কে থাকবে বল। বাবা মা কাল সাঝেরবেলায় কুটুমবাড়ি গেছে সেই জঙ্গলীর চরে। আজ কাল আর আসবে না। কাল রাতে তোর গান শুনে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক বেলায় ঘুম ভেঙ্গেছে। তাই মাঠে কাউকেই দেখিসনি।

ওঃ, বলেই ফরিদ পথ চলতে থাকে।

কোথায় যাচ্ছিস?

ঘরে। তুই বলেছিলি বাছুরডোবায় আসতে, তাই এসেছিলাম।

আমি যা বলি তাই বুঝি তুই শুনিস?

আগে শুনতাম না, এখন শুনি।

আমি যে তোকে বিয়ে করতে বলেছিলাম, শুনেছিস কি?

শুনব। মনের মত মেয়ে পেলেই শুনব।

তোর মনের মত মেয়ে কবে পাবি! এখানে তোর বউ জুটবে না।

জুটবে রে জুটবে। তোর মত যে মেয়ে আমাকে শাসানি দেবে সেই হবে মনের মত মেয়ে।

চোখ মুখ রাঙ্গা করে জনাই বলল, একটা মেয়ে কি আরেকটা মেয়ের মত কখনও হয়। তা হয় না রে ফরিদ। যা, ঘরে যা।

তুই রাগ করছিস জনাই। তোর তরেই তো ঘুরে ফিরে এসেছি, তুই বলেছিস, এখনও আসছি।

জনাই রাগতভাবে বলল, তোর মুখে আগুন। যা হবার নয় তাই মনে করে হা-হুতাশ করছিস। বাবা-মায়ের কানে উঠলে তোর সাথে কথা বলতে দেবে না। এমন কথা মনে রাখিস, মুখে বলিস না।

ফরিদ ঠিক বুঝতে পারেনি জনাইকে।

ফিরে এসে দোতারা নিয়ে বসল। গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে দোতারা হাতে করেই গেল হাসিমের বাড়িতে। হাসিম তখন গরুকে জাবনা দিয়ে সবেমাত্র এক থালা পান্তা নিয়ে বসেছে সকালের নাস্তাপানি করতে!

কি খবর ফরিদভাই। সকালবেলায় দোতারা নিয়ে বেরিয়েছিস যে বড়?

আজ আবার আলকাপ আছে, তাই না রে?

আছে। রৌমারির চরে যাবি ফরিদ? সেখানে দু রাত আলকাপ শোনাব।

যেতে পারি। রৌমারি অনেক দূর। পাঁচ-ছ ঘণ্টা, উজানে দশ ঘণ্টাতেও রাস্তা শেষ হয় না।

শহরের খবর শুনেছিস? সব কিছু মাঙ্গা হয়েছে, চার পয়সার চাল আট আনা দশ আনা। লোকে কিনতে পারছে না। চরের মানুষ তাও কিছু পেটে দিচ্ছে, গাঁয়ের মানুষ খেতে না পেয়ে শহরের রাস্তায় ভিড় করছে। কাজ নেই, পয়সা নেই। ভিক্ষে করছে। জওয়ান জওয়ান মেয়েদের পিন্ধার মত শাড়িও নেই। লড়াইতে সব খেয়েছে।

ফরিদ কোন জবাব দিল না। এসব কথা কখনও সে ভাবেওনি।

তা হলে রৌমারি যেয়ে কাজ নেই। হালদারদের সবকটা নাও নিয়ে গেছে পুলিস। খেপ দেবার দুটো নাও আছে। হালদাররা বড় গাঙ্গে যায় না মাছ ধরতে। রৌমারী যাবার নাও পাওয়া যাবে না রে।

হাসিমও সম্মতি জানাল। তবে আজ রাতের জমায়েত বাদ যাবে সেটাও বলে দিল।

বাড়ি এসেই ফরিদ ডাকল ফেলানিবিবিকে।

ফেলানিবিবি গামছা দিয়ে কোন রকমে দেহটা ঢেকে দাঁড়াল তার সামনে।

ফরিদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর বুঝি শাড়ি নেই।

আছে একখানা। বাড়ির বাইরে যখন যাই তখন সেটা পিন্ধি।

বাড়িতে গামছা পড়েই থাকি। কাপড় যে পাওয়া যাচ্ছে না বাপ্। তোর বাপ গেছে শহরে। শুনলাম সেখানে কনটকের কাপড় দিচ্ছে। একখানা শাড়ি, না হলে ধুতি আনতে বলেছি, আর একটা লুঙ্গি তোর তরে।

বিকেলবেলায় ফরিদ গিয়েছিল আলকাপের জমায়েতে। বাড়ির খবর কিছুই সে শোনেনি, শোনার দরকারও কোনদিন হয়নি। অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেই ফেলানিবিবি ভাতের সানকি সামনে রেখে বলল, বাপজান ফিরে এসেছে রে ফরিদ। কনটকের কাপড় পায়নি। তোর লেগে দেড় টাকা দিয়ে একটা লুঙ্গি এনেছে, নিজের জন্য দেড় টাকা করে দুইখানা। বলল, লুঙ্গি দুটো সিলাই করে তোর শাড়ি করে নে।

খাওয়া বন্ধ করে ফরিদ ফেলানিবিবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি ভাবছিস?

এবার না হয় পর্দা হবে কিন্তু এরপর? তোদের সেই পীর সেবার শুনিয়ে গেল মোছলমানের মেয়েদের বেপর্দা হওয়া গুনাহ্। এরপর যখন আমাদের ঘরের মেয়েরা কাপড় না পেয়ে গামছা পড়ে থাকবে সেটা জিজ্ঞেস করতে বলিস বা'জানকে। বা'জান আবার ওই পীরের চেলা, এক নম্বরের মুরীদ। কাল আমি যাব শহরে। তোর এক জোড়া শাড়ি যোগাড় করতেই হবে।

কালকের কথা কাল হবে, আজ তো খেয়ে নে।

ফরিদ খেয়ে উঠেই শুয়ে পড়ল।

সকালবেলায় হরো মোড়লের ক্ষেতের দিকে যাওয়ার পথে জনাইয়ের সঙ্গে দেখা। জনাইয়ের পরনে নতুন তাঁতের শাড়ি। ফরিদ থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাল গান শুনতে গিয়েছিলি।

না রে। সাঁজেরবেলায় বাবা-মা এসে গেল। ঘরের কাম শেষ করে আর যেতে পারিনি।

এই শাড়ি বুঝি তোর বাপ এনেছে?

জনাই হেসে বলল, হাঁ। আমার লেগে এক জোড়া, মায়ের লেগে এক জোড়া।

ফরিদকে চুপ করে থাকতে দেখে জনাই জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছিস?

ভাবছি আমার দু'খানা শাড়ি দরকার।

কেন রে? বউ না আসতেই শাড়ি।

বউ নারে, মায়ের পিন্ধার কাপড় নাই। ভাবছি জলঙ্গীর হাটেই যাব। কাল সাহেববাজারে বাপজান গিয়েছিল, কাপড় পায়নি। মায়ের লজ্জা নিবারণ করাই কঠিন হয়েছে।

জনাই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, একদম শাড়ি নেই?

বললাম তো লজ্জা রাখাই দায়। গামছা পিন্ধে থাকে।

আয় আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাড়িতে। আমার একখানা শাড়ি তোর মাকে দিবি।

তুই পড়বি কি?

আমার আরও শাড়ি আছে। তুই তো জলঙ্গীর হাটে যাবি তখন শাড়ি কিনে আনিস। দুটো আনিস। একটা আমার আরেকটা তোর মায়ের।

অবাক হয়ে গেল ফরিদ। বলল, তোদের এই সব তাঁতের শাড়ির অনেক দাম।

তুই তো বলেছিলি আমার কথা মেনে চলিস। যা বলছি তাই কর।

ফরিদের হাতে শাড়ি তুলে দিয়ে জনাই বলল, মনে থাকে যেন যেদিন জলঙ্গীর হাটে যাবি দুটো শাড়ি কিনে আনবি তাঁতের হোক আর পাটের হোক, শাড়ি আনবি। যা বাড়ি যা।

তাড়িয়ে দিচ্ছিস জনাই।

জনাইয়ের চোখ ছল ছল করে উঠল, তোকে তো তাড়াতেও পারি না, কাছে ডাকতেও পারি না। তুই যা ফরিদ, যা চলে যা।

শাড়ি এনে ফেলানিবিবিকে দিতেই ফেলানিবিবি চমকে উঠল।

কোথায় পেলি?

চাঁইদের জনাই দিয়েছে। বলেছে, জলঙ্গীর হাটে তাঁতের শাড়ি পাওয়া যায়। সেখান থেকে কিনে এনে তাকে একটা দিতে হবে।

আশ্চর্য।

সেটাই আমিও ভাবছি। জনাই তোকে খুব ভালবাসে রে মা।

ফেলানিবিবি চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, জানি না।

ফেলানিবিবি সেদিন জানি না বললেও কয়েক মাস পরে ফরিদ যখন জলঙ্গীর হাটতলা থেকে একজোড়া শাড়ি এনে ফেলানির হাতে তুলে দিয়ে বলল, একটা জনাইকে দিয়ে আয়। তার কাছে কর্জা আছে, শোধ দিয়ে আয়।

ফেলানি ঘরের কাজ ফেলে সন্ধ্যাবেলায় গেল জনাইদের বাড়ি। জনাইয়ের হাতে নতুন শাড়িখানা দিয়ে বলল, কর্জা শোধ করলাম বিটি।

এত সহজে কর্জা শোধ হয় না চাচী।

বোকার মত ফেলানিবিবি বলল, সুদ চাস বুঝি।

ঘোড়ার ডিম। তুমি বুঝবে না। এই লাউটা নিয়ে ঘরে যাও। ফরিদকে বললে সে বুঝবে।

ফেলানিবিবি কচি একটা লাউ হাতে করে বাড়ি ফিরে এল। ফরিদকে বলল, জনাইয়ের কথা। ফরিদ সব শুনেও কোন জবাব দিল না।

আজকাল নদী পারাপার করাও বড় সমস্যা। খেপের নৌকা মাত্র একবার যায় আর আসে। ইচ্ছামত নৌকা চলাচল বন্ধ।

শহর থেকে ফরিদ এসে খবর দিল জাপান বোমা ফেলছে। কলকাতা থেকে লোক পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ জায়গায়। জিনিসের দাম বাড়ছে। গরীব মানুষের সামর্থ্য নেই পয়সা দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। সব জিনিসই কিনতে হচ্ছে অগ্নিমূল্যে। চাঁইপাড়ার আনাজও বিক্রি হচ্ছে বেশি দামে। তাদের ঘরে চাল না থাকলেও নগদ কড়ি কিছু আছে। যাদের নগদ কড়ি নেই, ঘরে চাল নেই তাদের জীবন জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

ফরিদ চাষে মন দিয়েছে।

এনায়েত ফকির পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে, তসবি ঘোরায়, ফেলানিবিবি সংসার করে, গরুর দুধ বিক্রি করে শহরের গোয়ালদের কাছে, তার জন্য দাদন নিয়েছে বছরের প্রথমে চাষের টাকা জোগাড় করতে। আলকাপের জমায়েত বন্ধ হয়ে গেছে। ইচ্ছা থাকলেও সবাইকে একত্র করে মহড়া দেবার সুযোগ আর নেই।

জনাইয়ের সঙ্গে ফরিদের দেখা হয়। জনাই জানতে চায়, তাদের সংসার চলছে কি ভাবে। ফরিদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, খোদা চালিয়ে নিচ্ছে।

জনাই তুই কেন বিয়ে করিসনি?—জিজ্ঞাসা করেছিল ফরিদ।

তুই কেন করিসনি ফরিদ?

বলেছি তো মনের মত বউ পাইনি।

আমিও মনের মত সোয়ামী পাচ্ছি না।

ফরিদ বুঝতে পারলেও সাহস করে কিছু না বলে ফেলানিবিবির আশ্রয় নিল।

একদিন হঠাৎ বলল, আমি বিয়ে করব মা।

ফেলানিবিবি খুশি হল। ফরিদের মাথায় হাত রেখে বলল, যা হোক তোর মন যখন বদলেছে এবার বিয়ের ব্যবস্থাও করব। তোর বাবাকে বলব উসমান মিঞার সঙ্গে কথা বলতে। উসমানের দিন চলে না। সব দিন দুবেলা ভাত জোটে না। তার মেয়ে রাজিয়াটা ডাগর হয়েছে। গেরস্থালিতে খুব পটু। রাজিয়ার সঙ্গে তোর বিয়ে হলে মানাবেও ভাল। রাজিয়াটাও বাঁচবে, উসমানও বাঁচবে। আমিও বাঁচব ওর হাতে সব তুলে দিয়ে।

ফরিদ বলল, উঁহু, হবে না।

কেন?

উসমান মিঞার ছেলেমেয়ে আটটা। রাজিয়াকে বাঁচাতে গেলে আমরা বাঁচব না। ওরা দলবল নিয়ে হাজির হবে। আমাদের হর সনের খোরাকিতে টান পড়বে।

কাউকে তোর পছন্দ হয়েছে?

হাঁ।

তাকেই বিয়ে কর। কাকে বিয়ে করতে চাস ফরিদ?

ফরিদ চুপ করে রইল।

কথা বলিস না কেন?

পরে বলব মা। আরও একটু ভেবে নিতে হবে।

তা তুই ভেবেই বলিস। তবে দেরি করিস না। তোর বাপকে বলতে তো হবে। সে তো সংসারের কিছুই দেখে না। আল্লার দরবারে মাথা ঠুকছে দিনরাত। সে চায় নিজের জায়গা বেহেস্তে পাকা করতে। তোর আমার কথা ভাবার অবসর তার নেই। তবুও তার মতটা তো নিতে হবে।

ফরিদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আগে ভেবে ঠিক করি।

ফেলানিবিবি বুঝেছিল ফরিদ যখন বিয়েতে আগ্রহী তখন তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না।

কদিন পরে ফেলানিবিবি জানতে চাইল, কিরে ভেবে ঠিক করলি?

আমার পছন্দমত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। অনেক ভেবে দেখলাম, ওটা অসম্ভব।

আমি চেষ্টা করব। তুই বল কাকে তোর পছন্দ।

সে কথা বললে তোর ভাল লাগবে না মা।

তবুও বল, দেখব চেষ্টা করে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জনাইকে।

জনাই হরো মোড়লের মেয়ে? অবাক হয়ে ফরিদের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ক্ষোভের সঙ্গে বলল, যা হবার নয় তার দিকে হাত বাড়াস না ফরিদ। সর্বনাশ ডেকে আনিস না বাপ্। হেঁদুর বিটির দিকে নজর কাড়িস না। হুজ্জত হবে। থানা পুলিস হবে। খুনোখুনীও হতে পারে। জনাইয়ের আশা ছেড়ে দে। উসমানের বিটির কথা ভেবে দেখ। তোর বাপ্‌কে বলে দেখতে পারি।

ফরিদ বলল, তোকে বললাম, এটা সম্ভব নয়। মন মানে না তাই তোকে বললাম। তুই যা বললি অতটা ভেবে দেখিনি।

ফেলানিবিবি ভবিষ্যত ভেবেই কথা বলেছে। জনাই বিয়েতে রাজি হলেও চাঁইপাড়ার কোন লোকই এই বিয়েতে সম্মতি দেবে না। থানা পুলিস হবার আগেই দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মুসলমানপাড়ার কোন লোককেই আর বিশ্বাস করবে না চাঁইপাড়ার লোক। চাঁইদের মেয়েরা

তো তাদের ঘরের মেয়েদের মত ঘরে আটকে থাকে না। সেই সুযোগে তাদের ঘরে মেয়ে এসে ফরিদের সঙ্গে ঘর বাঁধলে অনর্থ হবেই।

ফেলানিবিবির কাছে প্রথম ধাক্কা খেয়ে গুম হয়ে গেল ফরিদ। তবুও আশা ছাড়ল না। এই কথা জানাজানি হলে আর রক্ষে নেই।

জনাই তাকে বাদুড়ডোবায় যেতে নিষেধ করেছিল, আবার ডেকেও নিয়েছিল। সেদিনের সেই বয়স তাদের দুজনের কারুরই নেই। পট পরিবর্তন হয়েছে। বাদুড়ডোবায় যাবার সাহসও তার বিশেষ ছিল না। জনাইয়ের সঙ্গে তার মাখামাখি অনেকের নজরেই পড়েছে, তারা এই মেলামেশা খুব ভাল চোখে দেখবে এমন আশা বাতুলতা।

তবুও বাছুড়ডোবার আশেপাশে মাঝে মাঝেই ঘোরাফেরা করত। তার আশা ছিল একদিন না একদিন জনাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন সে সোজা কথাটা বলবে, যদি জনাই বিয়েতে রাজি হয় তা হলে কিভাবে তা সম্পন্ন করবে তাও স্থির করবে। একদিন সকালে উঠে হরো মোড়লের আনাজের ক্ষেতে গিয়ে হাজির হল। জনাই তখন একাই ছিল মাঠে। ফরিদকে দেখতে পেয়ে জনাই এগিয়ে এসে বলল, তোকে তো অনেকদিন দেখিনি ফরিদ, কোথায় ছিলি?

ফরিদ জনাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলল, মা না করেছে।

তাই বুঝি। ভুলেই গেছি। তোর তো মা আছে। মনে থাকে না। তাই তো মিঞাকে আর বাছুড়ডোবার আশে পাশে দেখি না। এবার তোর মায়ের কাছ থেকে বাছুরডোবায় আসার হুকুম নিয়ে আসিস। আসবি তো?

আমারও আসার ইচ্ছে হয় না। ভরসাও পাই না।

কেন রে? গোস্‌সা করেছিস। চাঁইপাড়ার মরদদের চেয়ে মাগীদের বেশি দাপট। আমি বলছি আসবি। মন সাফ করে আসবি। মনে পাপ থাকলে আখেরে ভীষণ কষ্ট হয়। বুঝলি?

কার কাছে আসব?

আমার কাছে। আমি তো তোকে ভরসা দিলাম। আমি কাউকে ডরাই না।

একটা কথা বলব ?

একটা কেন, হাজারটা বলবি। হাজারটা কথাই শুনব।

ফরিদ সোজাসুজি বলল, আমাকে তুই বিয়ে করবি জনাই ?

জনাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। জমিতে নিড়ানি দিতে লাগল অন্যমনস্কভাবে।

জবাব দিচ্ছিস না কেন ?

কি জবাব দেব ! তোর ভীমরতি ধরেছে। আমার বাবা যদি বিয়ে না দেয় ! আমারও তো একটা মত আছে। আমি যদি তোকে বিয়ে না করি।

ফরিদ বোকার মত তাকিয়ে রইল জনাইয়ের দিকে। তখন ছুটে পালাতে পারলেই বাঁচে। পা ফেলবার আগেই জনাই ডেকে বলল, রাগ করিস না ফরিদ। তোর সঙ্গে আমার বিয়ে কেউ মেনে নেবে না। চরে এমন ঘটনা কখনও হয়নি।

তুই রাজি তো ?

রাজি হলেও পথ নেই।

তা হলে চল্ পালিয়ে যাই।

না।

কেন ?

চোরের মত কোন কাজ আমি করি না। তোর সঙ্গে পালালেই চাঁইপাড়ার লোক থানা পুলিস করবে, তোদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ হবে। এতে জাত যাবে পেট ভড়বে না। চোরকে কেউ-ই ভাল বলে না। আজ তোর ঘর করতে যাব, কাল তুই যদি পালাস তালাক দিয়ে তখন আমার দুকুল যাবে।

ফেলানিবিবিও একই কথা বলেছে। ফরিদের এসব জানা উচিত। আঠার বিশ বছরের জনাই যা জানে চব্বিশ পঁচিশ বছরের ফরিদ যে তা জানে না, একথা কেউ বিশ্বাসই করবে না। চাঁইপাড়ার মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি করার ঘটনা একবার ঘটেছিল। হাঙ্গামাও হয়েছিল গুরুতর। মুরুব্বীরা মাঝে পড়ে সবাইকে শান্ত করেছিল।

এ খবর ও ঘটনা দুজনেই জানে। করিমবক্সকে চর ছাড়তে হয়েছে। কোথায় কোন চরে সে ডেরা বেঁধেছে তাও কারও জানা নেই।

তবুও ফরিদ বলল, তোর বাবাকে বলিস। সে তো রাজি হতে পারে।

তোর মত বোকা তো কখনও দেখিনি। বললাম তো, চাঁইপাড়ার মরদেব চেয়ে মাগীদের দাপট বেশি। বাবাকে হাঁ করতে হলে আগে মাকে হাঁ করতে হবে। সেটা কোনকালেই হবে না। বুঝলি। হেঁদুর ঘরে বিটির ওপব লালচ ছেড়ে দে।

কিন্তু।

কিন্তু ফিন্তু নেই। গোলমাল পাকাস না ফরিদ। বেশ তো আছি আমরা। তোর ঘরে গিয়ে না উঠলেই কি নয়? আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব চিরকাল।

ফরিদ ভাবতে ভাবতে ফিরে গেল।

অথচ হাসিনা এক কথায় রাজি হয়েছিল। হাসিনাকে সে ভালবেসেছিল, আর হাসিনাও ভালবাসার কসম খেয়েছিল। জনাই কসম খায়নি কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিটা তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আজ। হাসিনার মত গলে জল হয়নি। বরং বরফের মত শক্ত হয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে তার মনের আগুনকে। এমনটা হাসিনা যদি হত তা হলে কখনই তার ঘর ভাঙ্গত না।

বিয়ের আগেই ফেলানিবিবি বলেছিল, আমার আর তোর বাপের গরজ নেই তবে আমরা নারাজ নই। হাসিনার বাপ রাজি তো।

হাসিনা রাজি। বাপ রাজি না হলেও বিয়ে আটকাবে না। মিঞা রাজি, বিবি রাজি, কি করতে পারে কাজী। তোর আপত্তি নেই।

ফেলানি গম্ভীরভাবে বলেছিল, যা পেতে আকড় তা পেলে মিঠা। যা বিনা মেহনতে পাওয়া যায় তা শেষে তিতা হয় বাপ্। টাকা পয়সা যেমন বাজিয়ে নিতে হয় তেমনি বিবি আনার সময় ভাল করে বুঝে নিতে হয়।

তোর যত ভয়। হাসিনা বলে, ফরিদ তোকে না পেলে গাঙ্গের পানিতে ডুবে জান দেব।

ব্যাপারটা তোর মর্জির ওপর ছেড়ে দিলাম। যা ভাল বুঝিস

তাই করিস। আপশোষ করিস না। অথচ আজও আপশোষ করতে হচ্ছে ফরিদকে।

আবার বছর ঘুরে গেল।

হাসিম আর নুরু ফরিদের কাছে এসে আলকাপের ভবিষ্যত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখায়। ফরিদ যদিও প্রথমে রাজি হয়নি, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে বলল, বেশ লেগে পড়।

ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্র এল! দখিণা বাতাসে নদীর চরের মানুষ গা জুড়িয়ে গল্পগুজব করে কাটায়। মাসকলাইয়ের দানা ঘরে তুলে নিশ্চিন্ত হয় চাষীরা। এবার ছোলা চাষ জমেছে ভাল। বাজারে বুঁটের দাম বেশ তেজী। নগদ কিছু পাওয়ার আশায় অনেকেই আমনের পর ছোলার বীজ ফেলেছিল। চৈত্র আসতেই ঝাড়াই মাড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে, ঘরের মেয়েরা খুবই ব্যস্ত।

আকাশে মাঝে মাঝেই কালো মেঘ জমছে। যে কোন সময় কালবোশেখীর দাপট আরম্ভ হতে পারে। চরের মানুষরা প্রকৃতির নিষ্ঠুর শিকার হতে বাধ্য হয়। ঝড়ের দাপটে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হলেও আবার নতুন করে আস্তানা পাকা করে। অবশ্য এরা অনেক আগেই সাবধান হয়ে খড়ের চালায় শক্ত বাঁধন দেয়। ওপার থেকে বাঁশ ভাসিয়ে এনে জড় করে চরে। পাঁচ ছটা পরিবার এক সঙ্গে যায় বাঁশ কিনতে কাতলামারি রাণীনগরে কিম্বা চারঘাট গোদা গাড়িতে। শ খানেক বাঁশ কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধে 'নৌকার মত ভাসিয়ে দেয় নদীতে। তিন-চারজন সেই বাঁশের ভেলায় লগি ঠেলতে ঠেলতে নদীর ভাটির কিনারা ধরে আসতে আসতে কখনও একদিনে কখনও তুইদিনে, অনেক সময় চারদিনেও তারা এসে পৌছায় হোগলবাড়িয়ার চরে। আবহমান কাল এই ভাবেই চরের মানুষ ঘর বেঁধেছে। বাঁশের দর্মা, চাটাই, ঝুড়ি-টুকরি তৈরি করে নিত্য প্রয়োজন মিটিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে এরা লড়াই করে কিন্তু ক্লান্ত হয় না। কত ঘর ভেসে যায় বন্যায়, কত মানুষের মৃত্যু ঘটে তাতেও তাদের লড়াকু মন আর দেহ পিছিয়ে পড়ে না।

আবার আলকাপের মহরা আরম্ভ হয়েছে।

হাসিম খুব আগ্রহী নয় ফরিদও দায়ে পড়ে মহরায় আসে। বেশি উৎসাহী লখা আর বেন্দা। ওরা বলে, হোগলবাড়িয়ার আলকাপ তামাম তল্লাটে নামী গাইয়ে। এটা একেবারে বন্ধ করা ভাল নয় ফরিদভাই। এবার পাঁচ গাঁয়ের মানুষ ধন্য ধন্য করবে। আর তুই হলি আলকাপের খাঁটি হীরে। তোকে বুকে নিয়েই হোগলবাড়িয়ার আলকাপ বেঁচে থাকবে।

চরের জমিতে তাড়াতাড়ি বাঁশ বাঁধা হল। লখা শহর থেকে হ্যাজাক বাতি ভাড়া করে এনেছে। সন্ধ্যা হতেই হ্যাজাক জ্বালানো হল। পিল পিল করে পিঁপড়ের সাড়ির মত পাঁচ সাতটা চর ভেঙ্গে মানুষ এল নৌকায় চেপে। প্রথম রাতেই ভিড় জমে গেল।

শেষ রাতে পালা শেষ।

যে যার মত ঘরে ফিরে গেছে। দূরের মানুষ নৌকা কিনারায় বেঁধে পাটাতনে শুয়ে পড়েছে।

হাসিম আর ফরিদ পোয়ালের গাদায় চুপ করে বসেছিল।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল নদীর ওপারের ঝাউবনের মাথায়।

হাসিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, দেখলি তো পীরের আক্কেল।

ফরিদ হাসল।

হাসছিস।

তোর শিকার মুখের কাছ থেকে ছুটে গেছে, আর আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তাই হাসছি।

ছোলেমানের বিটি এসেছে। কোলে তার একটা বিটি।

তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

না। সে তো এখন পর্দার বিবি। গাঁয়ের মানুষ পীরমার দোয়া পেতে গেছে তার কাছে। যারা গেছে তারাই বলল, ছোলেমানের বিটি ঘোমটা দিয়ে এমন করে মুখ ঢেকে রাখে কেউ তাকে ভাল করে

দেখতেই পায় না। তার ওপর পাঁচ ওক্ত নমাজ! বাস্‌রে। সেখানে হাসিম মিঞার ঠাঁই কোথায়। বে-নমাজী হাসিমের আশনাই সে ভুলে গেছে। ভালই হয়েছে রে ফরিদ, আমি তো ওকে সুখে রাখতে পারতাম না।

ফরিদ বলল, হুঁ।

তুই বোধহয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না।

শুনেছি। এত বছর পর পুরানো পীরিত তোর মন মাতাবে তা তো জানি না। তবে শুনেছি, পীরবাবা হেঁপো রুগী। পটল তুলতে দেরি নেই। অপেক্ষা কর। একদিন না একদিন ছোলেমানের বিটি খালাস হবে। তখন পুরানো পীরিত নিয়ে দরবারে আর্জি জানাস।

ঠাট্টা করছিস ফরিদ।

নারে, সত্যি বলছি। ওরা বলে মানুষের মন না মতি। কখন কি হয় তা কে জানে।

হাসিম চুপ করে গেল।

ফরিদ একবার বলল, আজকের আলকাপ কেমন জমেছিল বলত।

ফাস্টো কেলাস। সবাই ধন্য ধন্য করেছে।

দেখ হাসিম, আজ তোর বাজনা আমাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল। অমন বাজনা না থাকলে আমার গলা দিয়ে গানই বের হত না। এত সুন্দর তোর হাত। ছোলেমানের বিটিকে যদি পীরবাবা ধর্মের নামে ফুসলে না নিত তা হলে তোর বাজনা শুনে পাগল হয়ে যেত। আর সেই মেয়েটা যদি তোর ঘরে আসত তা হলে বোধ করি এমন বাজনা তোর হাত থেকে বের হত না। শোন তোর হতাশা তোকে বড় করবে।

আর তোর? তুই তো হতাশা নিয়ে বেঁচে আছিস। তাই তোর গলা সবাইকে পাগল করে দেয়। জানিস তো হেঁদুদের কেষ্টঠাকুর যখন বাঁশী বাজাত তখন বেন্দাবনের গয়লার মেয়েরা ছেঁকে ধরত তাকে। তেমনি তুই যখন গান ধরিস পাঁচ গাঁয়ের মেয়েরা কেমন যেন মেতে ওঠে, তাদের ফিস্‌ফিসানি শুনলেই বুঝতি ওরা গয়লা মেয়েদের মত তোকে ছেঁকে ধরতে চায়।

তা বটে। জানিস পানি যখন উথাল পাতাল করে তখন তাতে তেল ঢেলে দিলে শান্ত হয়। মন যখন উথাল পাতাল হয় তখন তেলের কাজ করে মানুষের সোহাগ। সোহাগ পেলেই শান্ত হয় মনটা। আমাদের তো কেউ সোহাগ জানাবার নেই তাই প্রাণটা আইঢাই করে। কি বলিস, ঠিক তো?

হাসিম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাড়ি চ। রাত শেষ হয়ে বিহান হতে চলল। পুবের আকাশ লাল হতে চলেছে। চলতে চলতে হাসিম বলল, আজ তোর গলা যেমন সুন্দর ভাবে খুলেছে, এমনটা কিন্তু কখনও শুনিনি। সবাই বাহবা দিয়েছে। ঘোড়ামারার চরে একদিন চল। সেখানেও আলকাপের জমায়েত বসাব।

আপত্তি নাই। তুই সব ব্যবস্থা করবি। আমি ওসব পারব না।

বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আলকাপের দল একদিন বিকেলে ঘোড়ামারার চরের ঘাটে নৌকা ভেড়াল। ঘোড়ামারার চরের বাসিন্দা চাষী আর গোয়ালা। চাষীদের সর্বাংশই বাঙ্গালী আর গোয়ালের একাংশ বিহারের লোক। তারা খোট্টা ভাষাও বলে বাংলা ভাষাও বলে। সংখ্যায় তারা খুবই কম কিন্তু শহরে দুধের জোগান দিয়ে আর্থিক বিষয়ে সচ্ছল। লড়াইয়ের বাজারে যখন কেরাসিন, কাপড়, এমনকি কাপড় কাচার সোডা ও নিত্য ব্যবহার্য লবনের আকাল দেখা দিয়েছে তখনও তাদের ঘরে কোন কিছুর অভাব নেই। এদের পূর্বপুরুষ কয়েক শ বছর আগে রুটিরুজির ধান্দায় এসেছিল, এখন পাকাপোক্তভাবে চরের বাসিন্দা।

ঘোড়ামারার চরে গোয়ালদের প্রতাপ বেশি। এমন কি গরু দিয়ে ক্ষেত নষ্ট করে দিলেও সহজে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। আলকাপের জমায়েত পাকা করেছে গোয়ালদের রামহরি। তারই আমন্ত্রণে এসেছে ফরিদ দলবল নিয়ে।

ঘাট থেকে সোজা ওরা গেল আলকাপের আসর যেখানে বসবে সেই মাঠে।

রামহরির ব্যবস্থা ভাল। ওরা পৌঁছুতেই কলাপাতায় চিড়ে দই

আর গুড় সাজিয়ে দিল দলের সবাইকে। বেশ বিনীতভাবে বলল, তুরা তো জাহ্ছিস, চরে আর কুছু ভাল চিজ নাই পাওয়া যায়।

সবাই মেনে নিল, সবাই প্রশংসা করল রামহরির আতিথেয়তাকে।

হাসিমের হাত ধরে ফরিদ গেল নদীর ঘাটে। বিকেলবেলায় মেয়েরা কলসী কাঁখালে এসেছে জল নিতে। বেশ লাইন দিয়ে তারা এসেছিল, বেশ লাইন দিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ঘোমটা সড়িয়ে দেখছিল আগন্তুকদের। আগন্তুকরা যে আলকাপের দলের লোক তা সবাই জানে।

যেতে যেতে দুটো মেয়ে ফিস্‌ফাস্‌ করে দাঁড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে এসে একটু ঘোমটা সড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই তো ফরিদ।

ফরিদ আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার মুখটা ভাল করে দেখা গেল না। অপরজনের মাথার কাপড় 'কিছুটা আলগা, তাকে কেমন চেনাচেনা মনে হল অথচ চিনে উঠতে পারল না।

চিনতে পারলি না ?

কেমন করে চিনব? তোদের ঘোমটার তলে কোন খেমটার নাচ তা জানব কি করে।

ছি ছি, এই কথা বলতে পারলি। মনে নেই তোর ? সেই ক'বছর আগে তুই আমাদের ঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলি।

ও হাঁ। এবার মনে পড়েছে। তা বিবিজান, কি মনে করে।

তোকে দেখে পুরানো কথা মনে পড়ল, সেই যে নছিরণ, যার তুই নাতি, তার এন্তেকাল হয়েছে রে। বাঁদি বিবির আর হিসাব নিতে হবে না। সবাই এখন জাতে উঠেছে। আজ তোর গান শুনব। কপাল ভাল। তোর গানের কথা শুনেছি, তোকেও দেখেছি, কিন্তু তোর গান শুনিনি।

আমার কপাল। আসিস জমায়েতে।

চল খালেদা, আর দেরি করিসনি। ঘরে অনেক কাজ। কাজ শেষ করে তবেই তো যাবি।

খালেদা এগিয়ে এসে বলল, তোরা কি আজই ফিরে যাবি ?

নাও পেলেই যাব।

ও আচ্ছা। বলেই তছলিমার পেছন পেছন খালেদা হাঁটা দিল!

আলকাপের জমায়েত শেষ হলেও ফরিদ ও তার দলবল ফিরতি নৌকা পেল না রাতের বেলায়। চরের নৌকা কেড়ে নিয়ে গেছে পুলিস, দু-একটা যা আছে তা গোয়ালদের। দুধের জোগান দিতে তারা যায় শহরে, সেই নৌকাতেই চরের লোক যায় শহরে। সকালে ওরা যখন শহরে যাবে তখনই আলকাপিয়াদের নামিয়ে দেবে হোগলবাড়িয়ার চরে। অগত্যা সকলকেই থাকতে হল ঘোড়ামারার চরে। ফরিদের চোখে ঘুম ছিল না। সকাল হতেই সে উঠে পড়ল। গিয়ে দাঁড়াল নদীর ঘাটে। গোয়ালরা তখনও প্রস্তুত হয়নি শহর যেতে। সকালের জলপান খাবার ব্যবস্থাও ছিল।

ফরিদ ঘুরছিল নদীর কিনারায়। পেছন থেকে কে যেন ডাকল, ওই ফরিদ মিঞা, কোথায় যাস?

ফরিদ ফিরে তাকিয়ে দেখে খালেদাকে।

কাল যাওয়া হয়নি? আরেকটা দিন থেকেই যাও। আমার বাড়িতে চল। নাস্তাপানি করে আসবি, আহা লজ্জার কিছু নেই। চল।

ফরিদ ইতস্তত করে বলল, তোর বাড়ির মিঞা আছে তো?

আছে আশমানে। এত দরকার কি, চল।

ফরিদ কেন যে খালেদার পিছু পিছু গিয়েছিল তা সে নিজেও জানে না।

ঘরের ভেতর চাটাই পেতে দিয়ে বলল, বস। তোর তরে খাবার কিছু নিয়ে আসি।

ফরিদ চুপ করে বসে রইল, খালেদা আসি বলে গেলেও অনেকক্ষণ না আসাতে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। চাটাই থেকে নেমে দরজায় পা দেবার আগেই ঘোমটা টানা একটা মেয়ে থালাভর্তি মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, পেছনে খালেদার হাতে ঘটি ভর্তি জল।

চিনতে পারিস ফরিদ?

কাকে?

যে তোর সামনে দাঁড়িয়ে। ওকে চিনিস। ঘোমটা তোল রে মাগী। বুঝে নে।

ফরিদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তির মত বলল, হাসিনা! ফরিদ যেন ভূত দেখল।

এবার চিনতে পেরেছিস দেখছি। খবির ওকে তালাক দিয়েছে।

ফরিদ গম্ভীরভাবে বলল, খবির ওকে বিয়েই বা করল কবে আর তালাক দিল কবে, তা তো জানি না।

কাজীর খাতায় যখন নাম আছে তখন বিয়েটা নিশ্চয়ই হয়েছিল। তালাকও দিয়েছে কয়েকদিন আগে। মোহারাণা বুঝে নিয়ে হাসিনা এসেছে। সাহস করে বাপের বাড়ি যায়নি। আমি ওর খালাতো (মোসতুতো) ভাইয়ের বউ, আমার কাছে এসেছে।

ভালই করেছে। তুমি এইজন্য আমাকে ডেকে এনেছিলে বুঝি?

হাঁ মিঞা। এবার বুঝে নাও।

ও প্রশ্ন আর নেই বিবিজি, হাসিনা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ও তো আমার ভালবাসা চায়নি, টাকা চেয়েছিল। টমটম গাড়ির গাড়োয়ানের বউ হওয়ার চেয়ে রহিস আদমি খবিরের ঘরে গিয়েছিল। আমাকে কেন আবার এর মধ্যে টেনে এনেছ বিবিজি। হাসিনা আমার কাছে মরে গেছে।

হাসিনা দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার হাত থেকে এনামেল করা সানকি থপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফরিদ ইদ্দতকাল পেরোলে অনেক খদ্দের ও পাবে। আমাকে ওর কথা বল না। একবার যে বিশ্বাস ভেঙ্গেছে, সে কোনদিনই বিশ্বাস রক্ষা করবে না বিবিজি।

মেঝেতে ছড়ানো মুড়ি বাতাসা মাড়িয়ে ফরিদ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খালেদার দূতিয়ালি ব্যর্থ করেই ফরিদ ফিরে গেল।

পথেই হাসিমের সঙ্গে দেখা।

নাওয়ের ব্যবস্থা হল ?

হয়েছে। সবাই মালপত্র নিয়ে নাওতে উঠেছে। তোর জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।

সূর্য তখন মাথার ওপর এমন সময় হোগলবাড়িয়ার ঘাটে নৌকা ভিড়ল। সারাটা পথ ফরিদ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। ঘাট থেকে সোজা গেল বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকেই ডাকল, মা।

ফেলানিবিবি ফরিদের ডাক শুনে ছুটে এল। এমন করুণভাবে কখনও ফরিদ তাকে ডাকেনি। কেমন একটা ভয় নিয়ে হাজির হল ফরিদের সামনে।

ফরিদ কিছু না বলে তাকিয়ে রইল ফেলানিবিবির দিকে।

কিছু বলবি ?

ফরিদ শুধু মাথা নাড়ল। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

ফেলানিবিবি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কিছু খাবি ?

এক ঘটি পানি দে, তারপর যা হয় দিবি।

জল খেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে ফরিদ ধীরে ধীরে সব কথাই বলল।

তুই কি বললি ?

বললাম, হাসিনা মরে গেছে। যে একবার অবিশ্বাসের কাজ করে তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ঠিক বলেছিস। ঠিক বলেছিস বাপ্। ঘরে যদি শত্রু থাকে তাতে জানমাল নষ্ট হয়। ওসব কথা আর ভাবিস না। হাসিনা সত্যই মরে গেছে তোর জীবনে।

জীবনটা যে ছেলেখেলা নয় তা ভাল করেই জানে ফরিদ।

পরের দিন বিকেলে হাসিম এসে বসেই বলল, ঘোড়ামারা থেকে আসার পর তুই তো একটা কথাও বলিসনি ফরিদ। তোকে খেয়েছে বিরহ। হাসিনা হাসিনা করে তুই যে বিবাগী হতে চলেছিস। হাসিনাকে ছেড়ে বড়ই কষ্টই কি বলিস! আমি-ই বা এ থেকে বাঁচলাম কোথায়।

ফরিদ চুপ করে বসে রইল।

কথা বলছিস না কেন ?

ফরিদ মৃদুস্বরে বলল, হাসিনাকে ছেড়ে যতটা কষ্ট তার চেয়ে বেশি কষ্ট তাকে পেয়ে।

পেয়েছিস ?

পাইনি। দেখেছি। পেতে চাইলে পেতেও পারি। বড়ই ঘৃণা রে। হাসিনা এতদিন বেঁচেছিল আমার মনে, এখন সে মরেছে। তাকে কবরে পৌঁছে দিয়েছি। তাজা হাসিনাকে মনের কবরে মাটি চাপা দিয়েছি রে হাসিম।

হাসিম কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, তোর কি হয়েছে রে ফরিদ ? এসব কি বলছিস।

কিছুই হয়নি। নদীর পানিতে যখন নাও চলে তখন ঢেউ আসে, ধাক্কা দেয় নাওয়ের গায়ে কিন্তু নাওয়ের তলার পানি নড়ে না, নাওকে ঠিক বুকে করে রাখে। এতদিন তাই ছিল আমার। হাসিনা ঢেউ তুলতো মনে, দোলানি উঠত কিন্তু নাওকে যেমন বুকে করে রাখে অতলের পানি তেমনি বুকে করে রেখেছিলাম হাসিনাকে। ঘোড়ামারার খালেদাবিবি আমার চোখ খুলে দিল, নাওয়ের তলা ফুটো থাকলে নাও যেমন ভুস করে ডুবে যায় ঠিক তেমনি ফুটো দেখলাম, পানি উঠল নাও ভর্তি, ভুস্ করে ডুবে গেল নাও। বুঝলি ?

মোটেই বুঝলাম না। তুই যেন আলকাপের গান বাঁধছিস। সোজা করে বল, নইলে আমিও তোর সঙ্গেই ভুস্ করে ডুবে যাব।

ছোলেমানের বিটির সঙ্গে তোর বিয়েটা যখন হল না, মুখের কাছ থেকে মেয়েটাকে ফুসলে নিয়ে গেল পীরবাবা তখন তোর কি মনে হয়েছিল।

হাসিমের মুখের চেহারাই বদলে গেল। ক্ষিপ্তের মত বলল, আমার ইচ্ছে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে বিসমিল্লা বলে পীরবাবাকে জবাই করি। আবার ভেবেছি আমরা তো খোদা ভরসা করেই বেঁচে আছি। খোদার যা ইচ্ছা তাই হবে, তাই হয়েছে, মাথা পেতে নিতে হবে খোদার হুকুম।

বলতে বলতে হাসিম যেন ভেঙ্গে পড়ল।

তোর দুঃখ বুঝি, তোর চেয়ে আরও দুঃখ আমার জন্য জমা ছিল

তা তো জানতাম না। হাঁরে যখন শুনলি পীরমা এসেছে মেয়ে কোলে করে তখন কি মনে হয়েছিল।

কিছুই মনে হয়নি। আমার তো বিয়ে করা বউ নয় যে দাবী জানাব। বুক পুড়ে খাক্ হলেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। ওর সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেজন্য পালিয়ে এসেছি নিজের ঘরে।

আর আমার কি হয়েছিল জানিস? খবিরের তালাকি বিবি হাসিনা এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি ওকে মেনে নিতে পারিনি। হাসিনা তো ইমানদারী করেনি তাই ঘেন্নায় ওর মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়ে চলে এসেছি ঘোড়ামারার চর থেকে।

হাসিম অবাক হয়ে শুনছিল ফরিদের কথা।

আবার বলল, তোর আর আমার ব্যাপার আলাদা। তবুও মনে হয়, আমাদের বড় অপরাধ আমরা গরীব। তাই ছোলেমান বুড়া পীরের গলায় তার বেটিকে ঝুলিয়ে দিল, আর তোর বিবি পয়সার লালচে তোর ঘর ছেড়ে খবিরের ঘরে গিয়ে উঠল। ছোলেমান হারামি কম নয়। শুনেছিলাম, নগদ দেড় হাজার টাকা গুঁজে দিয়েছিল ছোলেমানের ট্যাকে। টাকার লোভ, বুঝলি তো, বুড়োর কাছে মেয়ে বিক্রি করল। খোদার মুলুকে এমন অন্যায় কাজ করেও লোকে বেঁচে থাকে, আর এরাই আবার ধর্মের ফতোয়া দেয়।

ফরিদ বলল, টাকার লোভ! এটা তো কম নয়। টাকার লোভে ছোলেমান মেয়ে বিক্রি করেছিল, টাকার লোভে হাসিনা ঘর ছেড়েছিল, হিসাব করলে দুই সমান। আমাদের কসুর, ওই যে বললি, আমরা গরীব, বিবি নিয়ে ঘর করা কঠিন অপরাধ।

হাসিম বলল, তুই বিয়ে করে আপশোষ করছিস, আমি বিয়ে না করে আপশোষ করেছি। যোগ বিয়োগে একই দাঁড়ায়।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

এখন আমরা ভালই আছি।

তা বলতে পারিস ফরিদ কিন্তু সংসার করার আশা তো ছাড়তে পারিনি। এবার বিয়ে-সাদী করে ঘর বাঁধলে কেমন হয়? বাপজানও তাগাদা দিচ্ছে। মেয়ের খবরও আসছে।

বিয়ে করবি কর, তবে পীরিত করে বিয়ে করিস না। বিয়ে করে পীরিত করিস। তা হলে বউ ঘর ছাড়লেও তোর বুক ফাটবে না।

ঢাক ঢোলের শব্দ শুনে দুজনে উঠে বসল।

তাই তো মনে ছিল না, আজ বছরের শেষ দিন। জেলেপাড়ায় চড়ক। চল চল চড়ক দেখে আসি।

নারে যাব না, বলে হাসিম যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

ফরিদ লক্ষ্য করল তাদের পাড়া থেকে মেয়ে মরদ কাচ্চাবাচ্চা দল বেঁধে চলেছে বাছুরডোবার দিকে। জেলেপাড়ার এ চড়ক বাছুরডোবার মাঠে প্রতিবছর হয়। তিন গাঁয়ের মানুষ একত্র হয়। সামান্য কিছু বেচাকেনা হয় ছোট্ট মেলায়। নৌকা করে নদীর দুই পাড় থেকে দোকানিরা আসে নানা বেসাতি নিয়ে। বছরের এই একটা দিনই বাজার বসে চরে। সন্ধ্যার আঁধার নামলেই যে যার ঘরে ফিরে যায়, চড়কের মাঠ হয় ফাঁকা।

ফরিদ বলল, চল্ চল্। লড়াইয়ের মরশুমে বাজারে তো কিছুই পাওয়া যায় না। দেখি না গিয়ে মেলায় কি কি জিনিস এসেছে। আরেক কথা তো ভাবিস না কখনও, তিনটা গাঁয়ের মানুষ, উপরি পাশের চরের অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। সারা বছর তো একসঙ্গে এত লোকের সঙ্গে দেখা হয় না। এই তো একটা সুযোগ। নসীব ভাল হলে তোর নতুন বিবির সন্ধানও পেতে পারিস।

যা বলেছিস। বিবি না পাই বিবির খবর তো পাব। বলেই হাসিম উঠে পড়ল।

ফরিদ হেসে বলল, বিবি মনে করে জোয়ান মেয়ের পেছন পেছন ছুটিস না যেন। বিপদ ঘটবে।

ঢাকের বাদ্যির তালে তালে নাচতে নাচতে আসছে জেলেপাড়ার ছেলেরা। সবার পরণে লাল ধুতি মানকোচামারা। কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গাজনের গান। মেয়েরা কলসী কাঁখালে নিয়ে পিছু পিছু জল ছেটাতে ছেটাতে আসছে। দশবারটা দোকান বসেছে এখানে ওখানে। সবই প্রায় তেলে

ভাজার দোকান। আর আছে চিরুণি, ফিতে, কাঁটার দোকান। মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। একজন বসে বসে নাকি সুরে পুঁথিপাঠ করছে, তার লাল পাতলা মলাট দেওয়া কিছু বই বিক্রি করছে। লেখাপড়া জানা লোক গোটা চরে তিন-চারজনের বেশি নয়। পড়তে না পারলেও পুঁথিপড়া শুনতে বসে গেছে বয়স্কা মহিলারা আর সঙ্গে তাদের বাচ্চাকাচ্চা। দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফরিদ আর হাসিম এগিয়ে গেল চড়কের গাছের দিকে।

বিপিন হালদার পিঠে গামছা বেঁধেছে শক্ত করে। তার গামছার সঙ্গে শক্ত দড়ি বাঁধা আছে। সেই দড়ির মাথায় আড় করে বাঁধা বাঁশের চাকা। চড়কে পাক খাবে বিপিন। পিঠ ফোঁড়া ছিল আগের দিনে। এখন আর ফোঁড়া হয় না। কয়েক বছর আগে পিঠ ফুঁড়ে ঘা হয়ে মরেছে নিমাই হালদারের ছেলে অধীর। তাই পিঠ ফোঁড়া বাদ। গামছা বেঁধেই পাক খায় চড়কে। এবার বিপিনের পালা।

একজন বলল, ওরে বিপনে মুখে রক্ত উঠে মরবি না তো?

সেতো বাবা শূলপানির দয়া। কে মরে কে বাঁচে তা কেউ বলতে পারে কি। মরলে বাবার পায়ে ঠাঁই পাব তো।

মাঝের গাঁয়ের আনিস্সুর একবার চড়কে পাক খেয়েছে। এবারও আনিস্সুর এসেছে। তার আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। দুবার পাক খাওয়া ভোলানাথের নিষেধ। আনিস্সুর মন খারাপ করে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ফরিদ আর হাসিমকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

ফরিদভাই।

কেন রে আনিস্সুর।

ওরা এবার আমাকে পাক খেতে দিল না। বেশ, আসছে মাদারের নাচে ওদেরও বাদ দেব, বুঝবে তখন।

রাগ করিস না। ওদের যেমন কানুন তেমন কাজ। তোর আমার কথায় তো কাজ হবে না। ওখানে জিলাপি ভাজছে, ততক্ষণ নিয়ে আয় আটআনার। সবাই মিলে ভাগ করে খাব।

আটআনায় আর কটা হবে। দুটো টাকা দাও।

আনিস্থুর ঠোংগা বোঝাই জিলাপি আনতেই ফরিদ বলল, দাঁড়া। ওই লখা, ওই বেন্দা, এদিকে আয়।

লখা-বেন্দা তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে আকাশের দিকে মুখ করে বিপিনের পাক খাওয়া দেখছিল। ফরিদের ডাক কানে যেতেই এগিয়ে এসে বলল, কেমন আছিস ফরিদভাই।

ভাল আছি। লখা। হাত পাত।

বেন্দা হাত পাতল। লখা বলল, থাম। ওখানে শিবুরা আছে ডেকে আনি।

দেখতে দেখতে আট-দশজন জুটে গেল। জিলাপিতে টান ধরল। ফরিদ হাসিমকে জিজ্ঞাসা করল, তোর ট্যাঁকে কিছু থাকে তো দে।

হাসিম খুঁজে পেতে আরও দু টাকা বের করল। আনিস্থুর আবার গেল জিলাপি আনতে। চড়কের মেলায় মুখ মিষ্টি হল ভালই।

হাঁরে লখা, তোদের গাঁয়ের সবাই এসেছে কি?

হাঁ। তবে মেয়েরা বোধহয় সব আসেনি। আসবে। কেউ ঘরে থাকবে না। ঢাকে কাঠি পড়েছে, সব কাজ ফেলে রেখে আসবেই।

ফরিদের ইচ্ছা ছিল একবার জিজ্ঞাসা করে জনাইয়ের কথা। যে কোন কারণেই হোক জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

সূর্য ডুবতেই যে যার মত ঘরের দিকে রওনা দিল।

তখন ঢাকের বাদ্যি থামেনি। বিপিনকে মাটিতে শুইয়ে চোখে মুখে জল দিচ্ছে। সেখানে ভিড়ও জমেছে। ফরিদ দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়ে পুরুষের ভিড়। গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে ফরিদের গেঞ্জিতে টান পড়তেই তাকিয়ে দেখে পেছনে জনাই।

তুই কতক্ষণ এসেছিস জনাই?

সবে এসেছি। আসব না মনে করেছিলাম। ভাবলাম, অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি নিশ্চয়ই তুই আসবি, তাই এলাম।

কথা শেষ করে জনাই হাঁপাতে থাকে।

অমন করছিস কেন?

শরীর কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। বেশি কাজ করতে পারি না। হাঁফ্ ধরে যায়। তা তুই তো ভাল আছিস?

দেখতেই পাচ্ছিস। তোরা তো শহরে যাস। ডাক্তার কবরেজ করলে পারিস।

পারি কিন্তু ইচ্ছে হয় না রে ফরিদ। এখন ভাবি আর কিছু দিন বাদে বয়স তো ছুটবে ভাটিতে তখন আমাকে দেখবে কে?

আমি।

তুই। হাসির কথা বটে। মিঞাপাড়ার ফরিদ চাঁইপাড়ার জনাইকে দেখবে। কেন বলতে পারিস? লোকে তোকে মেনে নেবে মনে করিস কি?

ফরিদের মুখ থেকে একটা কথাও বেরলো না।

জনাই আরও কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারল না। যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল, ফরিদ লক্ষ্য করল চাঁইপাড়ার মেয়েদের দঙ্গলের সঙ্গে জনাই ফিরে যাচ্ছে। ফরিদও হাসিমের হাত ধরে বলল, চল হাসিম ঘরে যাই।

নতুন বছর এসেছে।

বোশেখে চরের বালি তেতে লাল হবার উপক্রম। সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, একটু মেঘ, একটু জল। দেবতা এবার বড়ই নিষ্ঠুর। প্রতিবার বোশেখে দু-একটা ঝাপটা আসে, আউশ চাষের জমি তৈরি করে চরের চাষীরা। এবার সব কিছুই আলাদা। ফরিদ বলল হাসিমকে, এবার চাঁইদের মত ডোঙ্গায় করে সোঁতার পানি সেচ দিয়ে জমিন কাদা করতে হবে রে হাসিম, গাঁয়ের সব জোয়ান মরদের কাজ। পারবি তো।

আমি পারব। উপায় কি বল, সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে যদি আউশের ফলন না পাই, তুই সভার আয়োজন কর, আমি ঘরে ঘরে খবর দিচ্ছি।

দেখি খোদার কি মর্জি। আমরা খোদার মার্ল, আমাদের দানাপানির ব্যবস্থা তো খোদাই করবে। তার ভরসায় আছি। তবে খোদা তো মুখে তুলে দেবে না, মেহনত করতে হবে।

সভা ডাকলেও সভার অধিবেশন হয়নি। সভার দিন বিকেল-বেলায় উত্তর-পশ্চিমের কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। সবাই সতর্ক হল ঝড় তুফানের। সন্ধ্যার আগেই আরম্ভ হল তুলকালাম কাণ্ড, যেমন ঝড় তেমন প্রবল বৃষ্টি, সঙ্গে শিল পড়তে থাকে। চাষীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পরদিনই হাল নিয়ে নেমে পড়ল চাষীরা। জমি তৈরি করতে হবে। গত বছর বানের প্রকোপ ছিল কম। জমিতে পলি পড়েছে কম। ফসল যে খুব ভাল হবে এমন আশা কম। সকালবেলায় ফরিদ গ্রামে বের হয়েছিল ঝড় তুফানের পরের অবস্থা দেখতে। ঝড়টা খড়ের চালের উপর দিয়েই গেছে, দু-একজনের ঘরের চালা ভেঙ্গে পড়লেও খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। গাজিপুর থেকে যারা এসেছে তারা বিশেষ কোন ক্ষতির কথা বলল না। কিন্তু নদীর কিনারায় এসেই ফরিদ চিৎকার করে উঠল।

লাশ! লাশ ভাসতে ভাসতে এসেছে। গতরাতে নিশ্চয়ই নৌকা ডুবি হয়েছে।

ফরিদ ভাল করে দেখল। মৃতব্যক্তির অর্ধেক দেহ নদীর জলে, বাকিটা ডাঙ্গায়। আহা রে! লোক জমায়েত হল, কিন্তু কেউ চিনতে পারল না মৃতব্যক্তিকে। সবার আশঙ্কা নৌকাডুবিতে আরও লোক মারা গেছে, তারা কোথাও ভেসে গেছে, অথবা কোন চরে আটকে গেছে তাদের দেহ।

কি করবি ফরিদ? সবাই জিজ্ঞাসা করল।

থানায় খবর দিতে হয়। লাশ তো হেঁদুর। চাঁইপাড়ার যারা আছ তারা লাশ টেনে তোল ডাঙ্গায়।

থানায় কে যাবে? পুলিসকে ওদের বড় ভয়। যে খবর দিতে যাবে তাকেই যদি আটক করে তখন কত যে হাঙ্গামা হবে তা কে জানে। শলা পরামর্শ করে স্থির করল, লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া হোক।

আরেকদল বলল, না। এখানে লাশ জ্বালাবার মত জ্বালানি নেই বরং নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হোক। ভাসতে ভাসতে অন্য কোন চরে গিয়ে আটকে থাকুক। তারাই করবে লাশের সৎকার।

ফরিদ কিছুই ভাবতে পারছিল না। ছোটবেলায় সে শুনেছে মরা মায়ের বুকের দুধ খেয়ে সে বেঁচেছিল। মরা দেখলেই তার সেই কথা মনে পড়ে। কেমন একটা বেদনা অনুভব করে। কাউকে বলতেও পারে না।

অনেক সময় কোন নারীকে যদি দেখে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে তা হলে অনিমেষ নয়নে সেই পবিত্র দৃশ্য দেখতে থাকে। সেও এমনি ভাবেই তার মায়ের বুকে মুখ রেখে দুধ খেয়েছে। তার মা-ও মমতায় তাকে জাপটে ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, শেষে হয়ত ক্লান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তবুও সন্তানকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে রেখে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। সময় মত যদি তাকে উদ্ধার করা না হত তা হলে সেও মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ত চিরতরে। তার এখনও মনে পড়ে বন্ধ্যানারী ফেলানিবিবির শুকনো স্তনে মুখ দিয়ে সে কাটিয়েছে তার প্রথম চারটি বছর। সে জানতেও পারেনি ফেলানিবিবি তার মা নয়। তবুও মায়ের মতই তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ফেলানিবিবি। সত্যকার মা যদি হত তা হলে আরও কত বেশি পেত তার কাছে সে হিসাব করার সময় এখনও সে পায়নি।

লাশের দিকে তাকিয়ে ফরিদ ভাবছিল এমনি অসহায়ভাবে তার মা মরেছে। তার পরিচয় খুঁজে পেয়েছে সবাই তাই আজও সে জীবিত কিন্তু এই পুরুষটির পরিচয় অজ্ঞাত। গাঙের জলে ভাসিয়ে দিলে এর পরিচয় চিরতরে মুছে যাবে মানুষের সমাজ থেকে। কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

আবার সবাই জিজ্ঞাসা করল, লাশটা কি করা হবে? মতৈক্য হল না। মুরুব্বীরা এসেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হল যে কেউ থানায় গিয়ে পুলিসকে সংবাদ দেবে না। তা হলে? ভাসিয়ে দাও, কবর দাও, জ্বালিয়ে দাও। দেবার অনেক পন্থা কিন্তু দেবার লোক নেই!

সবাই যখন শালিসী নিয়ে ব্যস্ত তখন চুপি চুপি ফরিদ এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। তার মতামতের কোন মূল্যই তো নেই। মুরুব্বীরাই

স্থির করবে লাশটা কি করা হবে। শেষ পর্যন্ত সবাই ফিরে গেল, লাশটা যেমন নদীর কিনারায় ছিল তেমনি রইল।

বিকেলবেলায় ফেলানিবিবি ফরিদকে ডেকে বলল, হাঁরে ফরিদ ঘাটে নাকি একটা লাশ এখনও পড়ে আছে। তোরা তার কিছু ব্যবস্থা করলি না তো। এরপর লাশ পচবে, শকুন নামবে, এটা কি ভাল!

আমি কি করব মা। মুরুব্বীরাই কিছু করতে পারল না।

নদীতে ভাসিয়ে দে। অন্য ঘাটে গিয়ে লাগুক।

আমি পারব না। তুমিই তো বলেছ, আমার মায়ের দাফন হয়নি। জানজার নমাজ পড়েনি মোল্লারা। অগতি হয়েছিল তার। এত জেনেও আমি কি পারি অন্যের অগতি করতে।

ফেলানিবিবি চুপ করে গেল।

এনায়েত ফকির সারাদিন তসবি হাতে নিয়ে বসে থাকে। ধর্ম চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা তার নেই। তাকে বলে কোন লাভ নেই।

গভীর রাতে ফরিদ ডাকল ফেলানিবিবিকে।

তোর কথাই ঠিক। চল আমরা লাশটা ভাসিয়ে দেই গাঙ্গে। লাশ ভাসতে ভাসতে চলে যাক দামুকদিয়া ঘাটে। চল।

এত রাতে?

আমি তো তোর সঙ্গে থাকব। আর কেউ জানবে না। হেঁদুর মরা। চাঁইপাড়ার কেউ এল না সৎকার করতে, জেলেপাড়ার বুড়োরা পুলিসের ভয়ে সিঁটকে গেছে। তার চেয়ে আমরাই সৎকার করে দেই। এক বোঁদা পোয়াল নিচ্ছি, ওর মুখে আগুন ছুইয়ে দেব তাতেই গতি হবে।

পরদিন সকালে কেউ লাশ দেখতে পায়নি ঘাটে।

ততক্ষণ লাশ ভাসতে ভাসতে দামুকদিয়া ঘাটে হয়ত পৌঁছে গেছে।

বোশেখ মাস কেটে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে রোদের তেজটা হঠাৎ বেড়ে গেল। আকাশে মেঘের আনাগোনা বন্ধ। আবার চিন্তিত হল চাষীরা।

চাঁইপাড়ায় নাম সংকীর্তন আরম্ভ হয়েছে। আকাশের মেঘের

কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু মেঘ দেবতা আরও নির্মম। কিছুতেই কর্ণপাত করতে চাইছে না।

হাসিম এসেছিল সন্ধ্যাবেলায়।

শুনেছিস ফরিদ ?

কি ?

শহর থেকে যারা এসেছে তারা বলছে দেশের বাদশাহ লড়াইতে কাবু হয়েছে। জেলা শহরগুলোতে লুটপাট হচ্ছে। রেলগাড়ি চলছে না, ইস্টিমার বন্ধ। কি যে হল ভেবে ঠিক করতে পারছে না শহরের মানুষ।

ওরা বসে বসে ভাবুক। আমাদের কে বাদশা হল তার চিন্তা না করলেই চলবে। এদিকে যা খরা দেখছি, পেটের ভাতই জুটবে না। তার ব্যবস্থা কে করবে বল।

হাসিমও কপালে হাত দিয়ে বসল।

তোর বিয়ের কি হল ? পেলি মনের মত মানুষ ? তোর বাপজান কি বলে ?

বাপজান তো বিয়ে দিতে মেয়ে তালাস করছে। কিন্তু।

কিন্তু আবার কেন ?

হাসিনা পালিয়েছিল তুই গরীব তাই না ? আমার বিবি যে পালাবে না তার কি ঠিক আছে বল। সত্যিই তো, পেট ভর্তি খেতে দিতে না পারলে, পরণে একজোড়া শাড়ি দিতে না পারলে বউ ঘরে থাকবে কেন ? লড়াইয়ের বাজারে পয়সা দিয়েও মাল পাওয়া যায় না, আর আমাদের ভরসা কয়েক মন ধান। তা দিয়ে বউয়ের সব চাহিদা মেটাব কি করে, তারপর বাচ্চাকাচ্চা জন্মালেই পেটে গামছা বাঁধতে হবে। মন ঠিক করতে পারিনি। বাপজান বলে, মোছলমানের বেটা বিটিরা সাদী না করলে গজব নামে। কোন রাস্তা ধরি তুই ঠিক করে দে।

অনেকেই তো দু-তিনটে বিবি পোষে। তুই একটা বিবি পুষতে পারবি না।

তুই পেরেছিস ! আর রহিস আদমিদের অনেক বিবি থাকে, যন্ত্রণাও থাকে অনেক। সে সব ওরাই জানে। অনেক রাত হল। এবার চলি।

উঠে দাঁড়িয়েই থমকে গেল হাসিম। বাছুরডোবার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ওদিকের আকাশটা লাল মনে হচ্ছে। কোথাও আগুন লাগেনি তো!

আগুনই লেগেছে। চল্ চল্ হাসিম দেখে আসি।

সোরগোল আরম্ভ হয়ে গেছে। গাজিপুরের লোক, মাঝগাঁয়ের লোক কলসী বালতি বদনা যে যা পেয়েছে তা নিয়ে ছুটেছে বাছুরডোবার দিকে। চিৎকার করছে আগুন আগুন। সবার লক্ষ্য বাছুরডোবার চাঁইপাড়ার দিকে। তিনটে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জেগে উঠেছে। সোঁতো থেকে জল ভর্তি করে সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত। আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। জ্যৈষ্ঠের তপ্ত দিনে শুকনো খট্‌খটে খড়ের বাঁশের বাড়িগুলো একটার পর একটা আগুনের খোরাক হয়ে যাচ্ছে।

চাঁইপাড়ার ছোট ছোট কুটিরগুলো একটার পর একটা পুড়তে থাকে, আগুন ছড়াচ্ছে জোরবাতাসে ভর করে। বাঁশের তৈরি বাড়ির বাঁশগুলো ভয়ঙ্কর শব্দ করে ফাটছে, আগুনের শিখা আকাশকে লাল করে তুলেছে। ধুঁয়োর কুণ্ডলীর সঙ্গে পোড়া খড়ের ছাই উড়ে উড়ে পড়ছে চারিদিকে। কুটিরের বাসিন্দারা ছোটাছুটি করে ঘরের মালপত্র নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তাদের যা কিছু সহায় সম্বল টেনে বার করছে। গোয়ালের গরুগুলো ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলো হাম্বা হাম্বা শব্দ করতে করতে যে যার মত এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে। যাদের সব কিছু গেছে তাদের চোখে উদাস দৃষ্টি, অন্য সবাই মাথায় হাত দিয়ে হায় হায় করছে। শিশু ও বৃদ্ধরা গৃহপালিত অন্যান্য জন্তু নিয়ে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে তাদের সাজানো সংসারের গুরুতর পরিণতির দিকে।

ফরিদের সামনে দাউ-দাউ করে জ্বলছিল হরো মোড়লের বাড়ি। শশীবালা পাথরের মত শক্ত হয়ে দেখছে তার সাজানো সংসার নিমেষে আগুনের মুখে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বাতাস যেন সুযোগ পেয়ে জোরে বয়ে চলেছে। আগুনের হল্কা ছুটে আসছে। যারা আগুন নেভাতে জল দিচ্ছিল তাদের মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। অনেকেই আগুনের হল্কার দিকে এগুতে সাহস পাচ্ছে না। হরো মোড়লের সংসারের সব কিছুই

টেনে বের করেছে জনাই আর হরো মোড়ল। সেগুলো অনেক দূরে চরের বালির ওপর সাজিয়ে রাখছে জনাই। মাঝেরপাড়ার লোকের সঙ্গে গাজিপাড়ার লোকেরা নেমে পড়েছে বাছুরডোবার লোকদের সাহায্য করতে। কেউ জল ঢেলেছে, কেউ ওদের জিনিসপত্র বের করে আনছে, কেউ অক্ষত বাড়িগুলো জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে। সবাই ব্যস্ত, কারও দিকে বিশেষ নজর দেবার কেউ নেই।

হঠাৎ হরো মোড়লের চিৎকার শোনা গেল।

ওরে জনাই, গোয়ালে আগুন লেগেছে। গরু বাছুরগুলো আটকে আছে, বের কর শীগ্‌গীর।

গোয়াল থেকে গরুর আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে।

গোয়ালটা একেবারে তাদের বাড়ির পেছনে। আগুন এড়িয়ে বেশ ঘুরে যেতে হয়।

হৈ-হৈ গোলমালে কারও কথা ভাল করে শোনা যাচ্ছিল না। হরো মোড়লের চিৎকার শুনে জনাই ছুটে এল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাশে দাঁড়িয়েছিল বেন্দা জেলে, তার হাত থেকে কাস্তে কেড়ে নিয়ে জনাই ছুটল গরুর গলার দড়ি কেটে দিতে। ফরিদ তাকে ছুটতে দেখে দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরে বলল, যাস্‌ নে জনাই। আমি যাচ্ছি। দে কাস্তে। আমি গরুগুলোকে বের করে আনছি। জনাই ফরিদকে ধাক্কা দিয়ে বলল, তুই সর্‌। আমি যাব। বলেই জনাই ছুটে গেল গোয়ালের দিকে। চক্ষের নিমেষে জনাই গিয়ে ঢুকল গোয়ালে।

গরুবাছুরগুলো তখন করুণস্বরে ডাকছে, গোয়ালের একদিকে তখন আগুন ধরে গেছে। গরুবাছুরের কয়েকটার দেহ প্রায় ঝলসে গেছে। জনাই ছুটে গিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে দিতে না দিতেই হুড়মুর করে জ্বলন্ত খড়ের চালা ভেঙ্গে পড়ল। কোন রকমে দুটো গরু বেরিয়ে গেছে, কিন্তু শোনা গেল জনাইয়ের আর্তনাদ। ফরিদ আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গেল জনাইকে টেনে বের করতে। কোন রকমে জনাইকে কাঁধে করে বের করে আনল। ততক্ষণ জনাইয়ের পিঠের বেশ খানিকটা

পুড়ে গেছে। আর দেরি করা উচিত নয় মনে করেই ফরিদ জনাইকে কাঁধে করে ছুটল তার বাড়ির দিকে।

ফেলানিবিবি দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে। ফরিদ চিৎকার করে বলল, শীগ্‌গীর একটা চাটাই পেতে দে মা। জনাই পুড়ে গেছে। একটা শাড়ি নিয়ে আয়। শাড়িটা জড়িয়ে দে ওর দেহে।

ফেলানিবিবি ফরিদের কথা মত চাটাই পেতে শোবার ব্যবস্থা করে দিল। জনাইয়ের তখন বোধহয় জ্ঞান ছিল না। যন্ত্রণায় শুধু গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছিল তার মুখ থেকে। ফেলানিবিবি আর ফরিদ ধরাধরি করে জনাইকে উপুর করে শুইয়ে দিল। এরমধ্যেই হরো মোড়ল, শশীবালা, রামু, মুংলী, লখা, হাসিম পৌঁছে গেল। এদিকে জনাই ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ছিল, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করছিল। শশীবালা হাউ-হাউ করে কাঁদছে, মাঝে মাঝে সুস্থির হয়ে চোখ মুছে জনাইয়ের মুখের কাছে কান রেখে শুনতে চেষ্টা করছে, জনাই কি বলছে। কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তখনও তারা স্থির করতে পারেনি জনাইকে নিয়ে কি করা হবে।

সকালের আলো ফুটল। চাঁইপাড়ার আগুন তখন নিভলেও ধুঁয়োর কুণ্ডলী মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। সবাই দেখতে পেল চাঁইপাড়ার অর্ধেকটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কার কত ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব করছে অনেকেই। তবে ক্ষতির খতিয়ান কখনও হবে কি না সন্দেহ। সবাই শুনেছে হরো মোড়লের মেয়ে জনাই আগুনে ঝলসে গেছে। যাদের ঘর পোড়েনি, তারা আহা বলে সমবেদনা জানিয়ে ভিড় করেছে ফরিদের বাড়ির সামনে। যাদের সব কিছু পুড়ে খাক্‌ হয়েছে তারা কপালে হাত দিয়ে চিন্তা করছে নতুন করে ঘর কি ভাবে বাঁধা যায়। বেলা পড়তে থাকে ভিড় বাড়তে থাকে। সবার মুখে আহা, আর চোখে করুণ চাহনি।

নারকোল তেলের সঙ্গে চুনের জল মিশিয়ে মলম তৈরি করে আনল লখার মা। ফেলানিবিবি জনাইয়ের পোড়া ঘায়ে প্রলেপ দিয়ে বাতাস করতে থাকে। শশীবালা জনাইয়ের-মাথার কাছে বসে চোখের জল

ফেলছিল। ফরিদ তাকে উঠিয়ে এনে বসিয়ে দিল ফেলানিবিবির চাটাইতে। মুংলী হাত বদল করছে পাখার। টানা বাতাস দিচ্ছে গাঁয়ের মেয়েরা একের পর এক এসে জনাইয়ের পাশে বসে। হরো মোড়ল পায়চারি করছে বাড়ির সামনে। ফরিদ মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যাচ্ছে। নিরুপায়ের মত জিজ্ঞেস করছে, কেমন আছে জনাই।

ওরা প্রত্যেকবারই বলছে, ভাল।

হরো মোড়ল সাহস করে মেয়ের পাশে যেতে পারছে না। জনাইয়ের পোড়া দেহ আর করুণ আর্তনাদ তার বুকে শেলের মত বিঁধছিল। যারা জনাইকে দেখে আসছে তাদের মুখে শুধু হতাশার ভঙ্গী। জনাই যে বাঁচবে না, এটা সবাই বলাবলি করলেও ফরিদ আশা ছাড়েনি।

একটু বেলা হতেই জেলেদের নৌকায় শহরে গেল।

অনেক কষ্টে শহরের ডাক্তার নিতাই সরকারের হাতে-পায়ে ধরে অনেক টাকা কবুল করে বিকেলবেলায় নিয়ে এল চরে। নিমাই সরকার রুগী দেখে কোন মতামত না দিয়ে শুধু মাত্র ওষুধের ব্যবস্থা করে ফিরে গেল শহরে। যাবার সময় উপদেশ দিয়ে গেল, হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভাল হত। এখানে তো পোড়া রুগীর চিকিৎসা ভালভাবে করা সম্ভব নয়।

ফরিদ ডাক্তারের পাওনা ও ওষুধের দাম মিটিয়ে স্থির হয়ে বসল। সারাদিন তার খাওয়া হয়নি। ফেলানিবিবি এক বাটি মুড়ি পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বলল, তুই খা বাপ। আমি পানি এনে দিচ্ছি।

ফরিদ ফেলানিবিবির দিকে তাকিয়ে রইল। এই দুঃসময়ে ফেলানি-বিবি যদি তার শেষ সম্বলটুকু তার হাতে তুলে না দিত তা হলে ডাক্তার ও ওষুধের দাম সে মেটাতে পারত না। মুড়ির বাটিতে হাত রেখে ফরিদ বলল, তুই তোর তবিল ঝেড়ে ঝুড়ে সব দিলি মা।

হাঁ দিলাম, বলেই ফেলানিবিবি থামল। কিছুক্ষণ পরে বলল কেন জানিস? জনাইয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি, জনাই তোর ঘর করেনি, জনাই হিন্দু আমরা মোসলমান, সবই ঠিক। তবুও জনাই আমার বেটার বউ।

ফেলানিবিবির কথা শুনেই ফরিদের দু চোখ ভর্তি হয়ে গেল জলে।

নে খা। আল্লার ওপর সব ছেড়ে দে বাপ্। যা হবার তা হবেই, রুখবার মালিক স্বয়ং খোদাতালা।

হরো মোড়ল নতুন করে ঘর তৈরির ব্যবস্থায় গেছে বাছুরডোবায়। শশীবালা কোন রকমে দু-এক মুঠো মুখে দেয় আর চাটাই পেতে বসে থাকে উঠোনে।

দিন কাটে, রাত কাটে। ফরিদ দুবার গেছে শহরে ডাক্তারের উপদেশ নিতে। বাছুরডোবার চাঁইপাড়ার লোকেরা সব খরচ দিয়েছে।

জনাইয়ের জ্ঞান ফিরলেও যন্ত্রণায় ছটফট করে। তার হাত পা চেপে ধরে রাখতে হয় সব সময়। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে সেও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল।

ফরিদ তাকে সময় মত ওষুধ খাওয়ায়, ফেলানিবিবি মলম লাগায়। ফরিদ মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, কিছু খাবি জনাই, কিছু খাবি জনাই?

বলতে চেয়েও বলতে পারে না। মাঝে মাঝে পাশ ফিরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সবার দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

আটদিনের মাথায় জনাই একবার মুখ খুলেছিল। ফরিদকে পাশে ডেকে নিল ইঙ্গিতে। ঠোঁট দুটো নড়তে থাকে।

ফরিদ ব্যগ্রভাবে শুধোয়, কি বলবি জনাই।

আর বাঁচব না রে ফরিদ।

কে বলল, তোকে বাঁচাতে কত মেহনত করছি জানিস।

চুপ করে গেল জনাই।

তোর মাকে ডাকব।

ডাক।

শশীবালাকে ডাকতেই মা ছুটে এল।

কিছু বলবি জনাই?

আর বাঁচব না। তুই যেন কাঁদিস না মা। তোর ছেলে রইল ফরিদ।

শশীবালা হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। ফেলানিবিবি শশীবালার হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। বলল, অমন করে কাঁদতে হয় না

রে শশীদিদি। বেরামী বিটির ভাল হয় না এতে। মনে জোর রাখ। ডাক্তার ওষুধ করা হচ্ছে। তোর বিটি তুই ফিরে পাবি। অমন করতে মানা।

জনাই ইঙ্গিতে ফরিদকে পাশে বসতে বলল।

জানিস ফরিদ। তোকে তো পাইনি। পাবও না। তবুও জনাই তোরই ছিল। আমি মরলে কাঁদিস না যেন। আরেক জনমে আমরা বড়গাঙ্গে নৌকা ভাসাব, তুই হবি হালদার আমি হব মেছুনি।

আরও কিছু হয়ত সে বলত, চেষ্টাও করেছিল।

দেহের ক্ষতগুলো ধীরে ধীরে পচে উঠছিল। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই তার কাছ থেকে দূরে থাকত। ফেলানিবিবি, ফরিদ আর শশীবালা তার কাছ ছাড়া হত না।

কথা বলার চেষ্টা করেও জনাই কথা শেষ করতে পারেনি। হঠাৎ থেমে গিয়েছিল তার বুকের স্পন্দন। নিশ্চল হল তার দেহ। অতৃপ্তির হুতাশনে পুড়ে সে বিদায় নিল।

বিকেলবেলায় চরের কিনারায় চিতা সাজানো হল। বাছুরডোবা আর মাঝের গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা ভিড় করল জনাইকে শেষবারের মত দেখতে।

অনেক কিছু হারিয়ে শশীবালা আর হরো মোড়ল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। ফরিদ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পাথরের মত শক্ত চোখে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে চিতার দিকে।

চিতায় আগুন দেবার পর ফরিদকে আর দেখা গেল না সেখানে। সবার অলক্ষ্যে ফরিদ যে কোথায় গেল তা কেউ বলতেও পারল না।

রাতের বেলায় ফরিদ ঘরে না ফিরতেই ফেলানিবিবি চঞ্চল হয়ে উঠল। সকালবেলা এনায়েত ফকিরকে ডেকে বলল, শোন মিঞা, ফরিদ কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি। তার তল্লাস কর।

এনায়েত প্রবোধ দেবার মত বলল, আসবে। কোথাও আড্ডা জমিয়েছে। এই বেলাটা দেখ।

না, না। লক্ষণ ভাল নয়। তুই যা, ফরিদকে খুঁজে নিয়ে আয়।

ফরিদ যদি না আসে তাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হব।

এনায়েত ফকির তসবির ঝোলা হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। দুপুরবেলায় ঘুরে এসে বলল, ফরিদের খবর কেউ জানে না। কেউ কেউ বলল, ও বোধহয় শহরে গেছে।

ফেলানিবিবি চুপ করে বসে রইল।

খেতে দে ফেলানি।

তুই নিয়ে খা। ফরিদ না এলে আমি কোন কামই করব না।

কয়েকদিন পরে চরের কিনারায় পাওয়া গেল ফরিদকে। তার উসকো খুসকো চুল। কোন রকমে কোমরে জড়ানো একটা আধা লুঙ্গি। সে চিৎকার করছে আগুন আগুন, পানি নিয়ে আয়। উঃ সব পুড়ে গেল। পর মুহূর্তে সে গান ধরল, 'ফরিদের নানা, আমিনার নানীকে করল নিকা।'

খবর পৌঁছাল ফেলানিবিবির কাছে।

ফরিদ পাগল হয়ে গেছে।

ফেলানিবিবি ছুটে এসে জাপটে ধরল ফরিদকে। বলল, চ ফরিদ তুই তো আমার একটাই ব্যাটা। তোর তরে আমার প্রাণডা আই ডাই করে। তুই ঘরে চ।

ফরিদ পাগল হয়ে চরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়। চরের মানুষ আলকাপী ফরিদের জন্য চোখের জল ফেলে। ফরিদ ঘুরে ফিরে জনাইকে যেখানে পোড়ান হয়েছিল সেখানে গিয়ে বালি খোঁড়ে দু হাত দিয়ে, বোধহয় জনাইকে খোঁজে বালির কবর-খানায়। মাঝে মাঝেই চিৎকার করে ওঠে, পানি দে, পানি দে।

আজও রাতের বেলায় অনেকে ফরিদের চিৎকার শুনতে পায়। পানি দে, পানি দে।